সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. প্রদীপ কুমার রায়

অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

সজীব কুমার বসু

এম.ফিল. গবেষক

রেজিঃ নং-২০৯

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১২-২০১৩

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় পিতা সরোজ কুমার বসু

মাতা অর্চনা রানী বসু

ও

ভাগ্নে সার্থক পাল- কে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সজীব কুমার বসু, এম.ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আমার তত্ত্বাবধানে 'সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. প্রোগ্রামের আওতায় তাঁর এই এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিঃসন্দেহে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উপর আমাদের প্রচলিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং আমি যতদূর জানি এ জাতীয় গবেষণা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণার খসড়া ও অধ্যায়গুলো চূড়ান্তভাবে পাঠ করেছি এবং তাঁর এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের অংশ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য উপর্যুক্ত মনে করছি।

(ড. প্রদীপ কুমার রায়)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ গবেষকের নিজের। এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা পি.এইচ.ডি বা উচ্চতর ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সজীব কুমার বসু
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ	II
প্রত্যয়ন পত্র	III
ঘোষণা পত্র	IV
ভূমিকা	VII-XIII
প্রথম অধ্যায় ঃ জীবন ও কর্ম	১-৯
১.১ পারিবারিক পরিচয়	২-৩
১.২ শিক্ষাজীবন	৩-৪
১.৩ কর্মজীবন	৪-৮
তথ্যসূচি	৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ রাধাকৃষ্ণণের দর্শনচিন্তা	১০-২৩
২.১ দর্শন	১১
২.২ গতিশীল ব্রহ্মবাদ	১২-১৫
২.৩ বুদ্ধি ও অপরোক্ষানুভূতি	১৫-১৭
২.৪ সভ্যতার সংকট	১৭-২০
২.৫ রাজনৈতিক দর্শন	২০-২২
তথ্যসূচি	২৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাদর্শন	২৪-৪২
৩.১ শিক্ষা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ	২৫-২৬
৩.২ শিক্ষায় ধর্মের স্থান	২৬-২৮
৩.৩ শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য	২৮-৩০

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য ৩০-৩১

৩.৫ মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত ৩১-৩২

৩.৬ শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত ৩২-৩৪

৩.৭ জাতির শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ৩৪-৩৮

৩.৮ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের ধারণা ৩৮-৪০

তথ্যসূচি ৪১-৪২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন ৪৩-৭৩

৪.১ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাঃ প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু ৪৪-৫২

৪.২ ধর্মের সংঘাতঃ হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ৫২-৫৭

৪.৩ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-১ ৫৭-৬৩

৪.৪ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-২ ৬৩-৬৯

৪.৫ ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ ৬৯-৭২

তথ্যসূচি ৭৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ৭৪-৭৯

তথ্যসূচি ৮০

উপসংহার ৮১-৮৪

তথ্যসূচি ৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ৮৬-৯০

পরিশিষ্ট ঃ ১৯৪১, নভেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ ৯১-৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানবজাতির নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে স্বীকৃত এ পৃথিবী নানান রহস্য এবং জটিলতায় পরিপূর্ণ। মানুষ অনাদিকাল থেকেই এসব রহস্য উদঘাটনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। স্থান কালের ব্যবধান-বিবর্তনে আবির্ভূত হয়েছেন কত না মুনি-ঋষি, পীর-দরবেশ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম ছোঁয়া দিয়েছিলেন দার্শনিকেরাই। গ্রিক মনীষী সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের প্রথম পথিকৃৎ। জগৎ জীবন সম্পর্কিত জটিল বিষয়াবলী কৌতূহলপ্রবণ মানুষের মনকে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত করেছে। কৌতূহলী মনকে পরিতৃপ্ত করতেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনের শুভ সূচনা। কালের পরিক্রমায় দর্শনের এসব শাখা-প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে কখনো ধর্মীয় বাতাবরণে, কখনো জড়বাদীয় আকারে আবার কখনো বা বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণী পর্যায়ে। ভারতীয় উপমহাদেশ তথা দর্শনচর্চার ইতিহাস যার অকৃপণ দানে উদ্ভাসিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। দর্শনের ইতিহাসের কালপুরুষ দার্শনিক রাজা। যিনি দর্শনকে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ এবং মনন ঋদ্ধ দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ মানবজাতিকে আলোকিত জীবনের পথ প্রদর্শন করেছে। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করে আদর্শ মানবোচিত জীবনের অনুসন্ধান ও দার্শনিক তাৎপর্য সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করাই ছিল তাঁর দর্শনচিন্তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ দর্শনকে কোনো আপতিক বিষয় হিসেবে দেখেননি। দর্শন ছিল তাঁর কাছে প্রাত্যহিক জীবনের মতোই সাদামাটা। যাপিত জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি দার্শনিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ জীবনকে দর্শনের আদলেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এজন্যই তাঁর দর্শন হয়ে উঠেছিল জীবন দর্শনেরই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি। দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, দর্শনের সাথে জীবন কত গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেও সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে গৌতম বুদ্ধের মতোই অহিংসা এবং প্রেমের বাণী দ্বারা নিজেকে

এবং বিশ্ব সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি মুক্তিকে আশ্রয় করেই অহিংসা এবং প্রেমের বাণীকে মানব সমাজের আদর্শ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি প্রেমের বাণীকে "মমত্ববোধ এবং সেবার নীতিতে" প্রতিস্থাপিত করে গিয়েছেন। যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকামী এক বিশ্বরাষ্ট্রের প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে। সমন্বয়ের সাধনাই ছিল রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। রাধাকৃষ্ণণ এ মহাসমন্বয় ঘটিয়েছেন জীবনের সঙ্গে দর্শনের, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সাথে অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার, ধর্মের সাথে ধর্মের, জাতির সাথে জাতির সমন্বয়ের এ যুগান্তকারী প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানব ভাবনা। তাঁর মানব ভাবনার যথার্থ স্বরূপ অন্বেষা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে 'এক বিশ্বজগৎ' গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। তিনি মনে করেন, যথার্থ দর্শনচর্চা এবং অনুশীলনের মনোভাবই মানুষকে দার্শনিকসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী করে তার কর্মময় জীবনকে অর্থপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের পটভূমিতে ছিল জীবন দর্শনের এক সার্থক নির্যাস যা প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞা, ধর্ম-দর্শন এবং বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সফল সমন্বয়সাধনে ভূমিকা রেখেছে। জীবনের নানা প্রতিকূলতা, ব্যক্তিগত সমস্যা-সংকট, রাজনৈতিক জীবন, পারিবারিক সংকটের সেই অভিঘাতের মধ্যেও তিনি দর্শনচর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন, সাধনা করেছিলেন সুমহান মধ্যপথের। মধ্যপথের সাধনাই পরিলক্ষিত হয় রাধাকৃষ্ণণের সমগ্র জীবনাচরণে। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দু ও শঙ্করাচার্যের বাণী থেকে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দর্শনে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল এবং কোরানের আলোচনা পর্যালোচনাই শুধু নয় এসবের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাচরণে। ভারতীয় ঐতিহ্যপন্থী দার্শনিকগণের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি পাশ্চাত্য ঐতিহ্যপন্থী দার্শনিকদের প্রভাবও বাদ পড়েনি তাঁর দর্শনে। এক্ষেত্রেও সমন্বয়ের সেই সুমহান ধারাটিকে রাধাকৃষ্ণণ রক্ষা করে

চলেছেন। তিনি যথার্থ অর্থেই একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। মানব মুক্তির বিষয়টিকে তিনি সার্বিকভাবেই বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সম্প্রীতি-সহাবস্থান, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, সাম্যবোধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে এক ভারসাম্যমূলক, কল্যাণময় বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আলোচ্য এই অভিসন্দর্ভে তাই তাঁর দর্শন চিন্তা, দর্শন ও শিক্ষা, দর্শন ও ধর্ম, হিন্দুধর্ম, দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়, অসাম্প্রদায়িকতা ও বিশ্বমানবিকতা, বর্তমান সময়ে তাঁর ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এবং নৈতিকতাসহ সংস্কারধর্মী কর্মপ্রয়াসকে যথাসম্ভব তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'জীবন ও কর্ম' শিরোনামে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পারিবারিক পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মস্থল ও কর্মজীবনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর অবাধ বিচরণ ও সুনাম সুখ্যাতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে রাধাকৃষ্ণণের ব্যক্তিক সংকট, পারিবারিক সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক পরিচয় এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নানান পটপরিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে সমাজের প্রগতিশীল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন তা আলোচ্য অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'রাধাকৃষ্ণণের দর্শনচিন্তা' শিরোনামে তাঁর দর্শন, গতিশীল ব্রহ্মবাদ, বুদ্ধি ও অপরোক্ষানুভূতি (Intellect and Intuition), সভ্যতার সংকট, রাজনৈতিক দর্শন, গ্রন্থ রচনায় তাঁর ভূমিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে দর্শন কী এবং জীবন ও সমাজের সাথে দর্শনের সম্পৃক্ততা মানবজীবনকে কীভাবে পূর্ণাবয়বে গড়ে তুলবে তাই সর্বতোভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি চিরায়ত ধর্মকে আলোকবর্তিকা রূপে চিত্রিত করে একে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা, উপলব্ধি ও অনুসরণপূর্বক জ্ঞান এবং প্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করণের মাধ্যমে মানবকল্যাণকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে রাধাকৃষ্ণণের 'শিক্ষাদর্শন' শিরোনামে আলোচনাকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে শিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর মতামত-শিক্ষায় ধর্ম, শিক্ষার অর্থ ও উদ্দেশ্য, শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য, নারী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা, ১৯৪১, নভেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে তাঁর ভাষণ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষানীতি আধুনিক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় আদর্শিক এবং প্রগতিপন্থী এক অনবদ্য প্রয়াস।

সমন্বয়ী দর্শন তথা পরমসত্তার আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে তাঁর শিক্ষানীতির নতুন দিক নির্দেশনার সাথে পুরনো অধ্যাত্মদর্শনের গভীর মূল্যমানগুলোকে সচল ও জীবন্তকরণের প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে। একটি ন্যায়পর ও কল্যাণমূলক আধুনিক বিশ্ব সমাজব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সমন্বয়ী ভাবনার কার্যকারিতা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ আদর্শিক বৈশ্বিক সময়োপযোগী এক কর্মপ্রয়াস।

চতুর্থ অধ্যায়ে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'ধর্মদর্শন' শিরোনামে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সত্য, সুন্দর ও শুভের সাধনা মানব মনের অলংকার। মানুষ সহজাত ভাবেই হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকে এবং কল্যাণমূলক কর্মে ব্রতী হয়। এই অধ্যায়ে তাই রাধাকৃষ্ণণের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা: প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু, ধর্মের সংঘাত: হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি, হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-১, হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-২, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ধর্মের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মধ্যম পথের সাধনা কিভাবে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল, নৈতিক, মানবিক দিকের উন্মোচন ঘটিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিশ্ববোধে উজ্জীবিত করার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে পারে সেটি এ অধ্যায়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সমকালীন বিশ্বে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের 'ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা' শিরোনামে আলোচনাকে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক নির্যাস এ অধ্যায়ে তুলে

ধরার প্রয়াস রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের চিন্তা-চেতনা, শোষণ বঞ্চনাহীন, নিপীড়ন নির্যাতনবিহীন এক সুমহান আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণাকে স্বাগত জানায়। জ্ঞানে, প্রেমে, কল্যাণে ভরপুর অর্থনৈতিক মুক্তির আবহে পরিচালিত ভারসাম্যমূলক সমাজব্যবস্থা এবং এক বিশ্ব জগৎ বা One World প্রত্যয় ব্যক্ত করার চিরন্তন আহ্বানই এ অধ্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন বর্তমান অস্থিতিশীল ও অস্থিরময় বিশ্বে একটি নতুন আলোকবর্তিকা হিসাবে কাজ করবে বলে আমরা মনে করেছি। এতে দেশ জাতি, সমাজ-সভ্যতা এক কথায় বিশ্বব্যবস্থা উপকৃত হবে এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের পেছনে যার অবদান অপরিসীম তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. প্রদীপ কুমার রায়। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা এবং আন্তরিক যত্নশীল প্রচেষ্টার জন্যই পূর্বাপর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও বিভাগীয় সকল শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক রাশিদা আখতার খানম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অনারারি অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম সরকার নানাভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত তথ্য উপাত্ত যতদূর সম্ভব মূল উৎস থেকে আহরণ করেছি। অভিসন্দর্ভের সাথে সংশ্লিষ্ট দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের আলোচনা ও গ্রন্থাবলি দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এছাড়া এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উৎস হিসেবে যেসব গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি সেগুলো হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গণপ্রন্থাগার, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢা.বি., দর্শন বিভাগের সেমিনার, দর্শন বিভাগ, ঢা.বি., জগন্নাথ হল গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ভারতীয় হাই কমিশন গ্রন্থাগার, গুলশান-১, ঢাকা উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

সজীব কুমার বসু

এম.ফিল. গবেষক

দর্শন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সজীব কুমার বসু, এম.ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আমার তত্ত্বাবধানে 'সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন' শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. প্রোগ্রামের আওতায় তাঁর এই এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিঃসন্দেহে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের উপর আমাদের প্রচলিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং আমি যতদূর জানি এ জাতীয় গবেষণা অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণার খসড়া ও অধ্যায়গুলো চূড়ান্তভাবে পাঠ করেছি এবং তাঁর এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের অংশ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করছি।

(ড. প্রদীপ কুমার রায়)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Phone: PABX 9661920-73 Ext. 6240, 6241, Fax: 880-2-9667222, E-mail: chairphilosophydu.@gmail.com

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ গবেষকের নিজের। এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা পি.এইচ.ডি বা উচ্চতর ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সজীব কুমার বসু
সজীব কুমার বসু
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও কর্ম

১.১ পারিবারিক পরিচয়

১.২ শিক্ষাজীবন

১.৩ কর্মস্থল ও কর্মজীবন

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম

১.১ পারিবারিক পরিচয়

রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে পৃথিবী ব্যাপী তাঁর খ্যাতি। তাঁর প্রতিভার ধারা ও পাণ্ডিত্য এমন ছিল যে তিনি যেকোন বিষয়ে অনায়াসে আলোচনা করতে পারতেন। তিনি শুধুই একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ছিলেন দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, সাহিত্যিক, সুবক্তা, কূটনীতিক, রাষ্ট্রশাসক এবং প্রশাসক।

দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রায় চল্লিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চিতোর জেলার তিরুতানি নামক গ্রামে গোঁড়া তেলেগু ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর রাধাকৃষ্ণণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার দ্বিতীয় সন্তান। অতি সাধারণ পরিবেশে তাঁর জীবন শুরু। তিরুতানির পাঠশালায় তাঁর শিক্ষা জীবনের সূচনা। তীক্ষ্ণ মেধা ও মননের পরিচয় দেন ভাবনার অবলীলাক্রমে। তিনি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এরিস্টটল বলেছিলেন দেশ তখনই সুখী হবে: "When King will be Philosopher and Philosopher will be King."[১] তিনি এই উক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বলেই যে স্মরণীয় তা নয়, একজন সর্বোচ্চ মানের গ্রন্থাকার ও শিক্ষক, সেই সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের প্রবক্তা বলে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। রাজনীতি অপেক্ষা চিন্তাশীল দার্শনিক বলে বিশ্বের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়। মানুষের অনেক কাজ তাঁর জীবনকালে বড় হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু পরে মানুষ তা ভুলে যায়। আবার অনেক কাজ আছে যেগুলি মানুষটি চলে গেলে পরেও বিশ্ববাসী মনে রাখে। আজকের বিশ্ববাসী রাধাকৃষ্ণণের দার্শনিক পরিচয়টিকে বেশি করে মনে রেখেছে। গোঁড়া, উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি সমাজ থেকে সরে দাঁড়াননি। সেই সময়টি ছিল উচ্চ নীচ জাতি ভেদাভেদের কাল। রাধাকৃষ্ণণের পিতা ছিলেন এদিক দিয়ে উদারপন্থী। পিতার আর্থিক সংগতি ছিল কম। দারিদ্র্যের মধ্যে পরিবার চালাতে হত কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারটিতে শান্তি ও সন্তোষ ছিল। ফলে শৈশব থেকে রাধাকৃষ্ণণ সকলকে নিয়ে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে শিখেছিলেন। জীবনের প্রথম বারোটি বছর কেটেছিল তাঁর গ্রাম তিরুতানি এবং তিরুপতিতে। দুটি স্থানই তীর্থক্ষেত্র বলে পরিচিত। তিরুপতি তো এখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্যটন কেন্দ্র। এ দুটি স্থানের প্রভাব রাধাকৃষ্ণণের জীবনে কম ছিল না। ধর্মপ্রাণতা ও ভারতীয় দর্শনের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি আকর্ষণ এখান থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। অন্ধভক্তি তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন যুক্তি দিয়ে ধর্ম ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিচার করতে। পরবর্তী জীবনে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও বেদান্তকে তিনি পাশ্চাত্য প্রভাবেই প্রকাশ করেছেন। বৈচিত্র্যের মধ্যেও ভারতে যে সংস্কৃতির একটি ঐক্য বিদ্যমান তা তিনি শৈশবেই অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন। শৈশব অভিজ্ঞতাই তাঁকে শিখেয়েছিল যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনই আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমরা সব ধরণের মানুষকে নিয়েই একটি জাতি এবং এই জাতির নাম ভারতীয় জাতি। পরবর্তীকালের জীবনে ভারতীয়তা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যবোধ রাধাকৃষ্ণণের জীবনের সকল কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ বিষয়ে সেই সময়ের একটি গান এখনও আমরা গেয়ে থাকি। গানটি–

"নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান,
দেখিয়ে ভারতে এক জাতির উত্থান
জনগণ মানিবে বিস্ময়।"[২]

ভারত-সংস্কৃতির এই মূলকথাটি আমরা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জীবন থেকে শিখতে পারি। তিনি ছিলেন ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনার জীবন্ত প্রতীক। স্যার ফ্রানসিস ইয়ংহ্যাস্‌ব্যান্ড তাঁর *Down in India* গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথ যেমন নবীন ভারতের কবি, তেমনি রাধাকৃষ্ণণও নবীন ভারতের দার্শনিক।"[৩]

১.২ শিক্ষাজীবন

রাধাকৃষ্ণণের জীবনের প্রথম বারো বছর দুটি গ্রামে কেটেছিল। এই গ্রাম দুটি হল তিরুতানি ও তিরুপতি। তিরুপতি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থান। তাঁকে পাঁচ বছর বয়সে তিরুতানির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এই বিদ্যালয়টির নাম ছিল আল্লামারাম বিদ্যালয়। এরপর তিনি তিরুপতিতে হারানস্‌বার্গ ইভানজেলিক্যাল লুথেরান মিশন হাইস্কুলে মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি ভেলোরে ভুরীস কলেজে দু'বছর প্রাক-স্নাতকস্তরে কলা বিভাগে ভর্তি হন। এই প্রাকস্নাতক স্তরকে ফেলো অব আর্টস (এফ.এ) বলা হতো। ১৯০৪ সালে এফ.এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ সালে দর্শনে সান্মানিক স্নাতক অর্থাৎ (বি.এ) ও ১৯০৯

সালে স্নাতকোত্তরে (এম.এ) প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৮ সাল থেকেই তাঁর দর্শনে বিষয়ের বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ হতে থাকে। ১৯০৮ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *"Ethics of the Vedanta"* দার্শনিক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। তিনি বি.এ পাশ করার পরেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর অসংখ্য শিক্ষামূলক বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ভারতের অন্যতম শিক্ষাবিদ হিসেবে আজও বিরাজ করছেন। তিনি নিজেই বলেছেন "Education has been my Special Subject"[৪]

রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে করে অনেক সময়েই বলেছেন শিক্ষা লাভের জন্য "Spirit of Education" অর্থাৎ আত্মত্যাগ প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যাত্মবাদের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ তার অর্থ সম্পদ বা জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সেই কারণেই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> "Education is the means by which we can tidy up our minds, acquire information, as well as sense of values. Education gives us not only elements of general knowledge at technical skills but also impart to us that bent of mind, that attitude of reason."[৫]

১.৩ কর্মজীবন

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ কর্মজীবনে কোথাও কোনো বাধার সম্মুখীন হননি। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁকে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয়েছে। ছাত্র পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয়েছে এবং অনেক সময় বাড়িতেও সাহায্য করতে হয়েছে। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ, পড়া পর্যন্ত ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। এই বৃত্তি এবং ছাত্র পড়িয়ে যা পেতেন তা দিয়েই নিজের খরচ চালাতেন ও পিতাকেও সাহায্য করতেন। ছাত্রাবস্থাতে অর্থ উপার্জনের যে পথ তৈরি হলো সেই থেকেই তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত। এম.এ পাশ করার পর তিনি ভেবেছিলেন আইন অধ্যয়ন করবেন, অর্থাভাবে তা হয়নি। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাবার সুযোগও পেয়েছিলেন, কিন্তু এই সুযোগও গ্রহণ করতে পারেননি। এম.এ পাশ করে বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর তিনি মাদ্রাজ সরকারের শিক্ষাবিভাগে চাকরি লাভ করেন। এই চাকরিটিও তাঁর মেধা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনায় নিম্নমানের ছিল। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে দর্শনের অধ্যাপক হিসাবে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি

Dhaka University Institutional Repository

কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে তিনি সাত বছর অধ্যাপনা করেন। মাদ্রাজে এডুকেশনাল সার্ভিসে L.T (Li Centiate Teaching) পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যিক ছিল। সেই কারণে ১৯১০ সালে তিনি মাদ্রাজের সৈদাপেতের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে এল.টি পাশ করেন। এই সময়কালে তাঁর বেশ কিছু দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তিনি একজন সফল শিক্ষক হতে পেরেছিলেন। দর্শনের দুর্বোধ্য বিষয়গুলোকে তিনি শিক্ষার্থীদের সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন এবং তাদের পড়াশোনায় সহযোগিতা করতেন। নিজগুণে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রশংসা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন এবং এই কারণে শিক্ষাজগতে একটি বিশেষ স্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনে ও চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলশ্রুতিতে তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে উপনিষদ, ভগবদগীতা, ব্রহ্মসূত্র এইগুলি খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। এ ছাড়া হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে প্রভাবিত হয়েছিলেন প্লাটিনাস, প্লেটো, ব্রাডলি, বার্গসন প্রমুখের দ্বারা তাঁর জীবন ও চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। *Philosophy of Tagore* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই সেটি উৎসর্গ করেন। গ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাধাকৃষ্ণণকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন- "অন্যেরা যেভাবে লিখতে পারত তুমি তার চেয়ে অনেক ভাল লিখেছো।"[৬]

১৯১৭ সালে রাধাকৃষ্ণণ রাজমুন্দ্রীতে গভর্নমেন্ট আর্টস কলেজে দর্শনের অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন এবং ১৯১৮ সালে মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মেন্টাল ও মরাল সাইন্সের জন্য মনোনীত করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই নিয়োগপত্র তাঁকে পাঠানো হয় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তাঁকে আশ্বাস দেন যে স্নাতকোত্তর স্তরে উচ্চতর গবেষণার জন্য সর্বরকম সুযোগ তাঁকে দেওয়া হবে। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *'Indian Philosophy'* বইটির মুখবন্ধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন।

১৯২৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

মাসে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ফিরে আসার পরে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম তাঁকে সাম্মানিক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান করেন। এই একই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তাঁকে গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতির পদে সর্ব্বসম্মতভাবে নির্বাচন করে। তিনি ১৯২৭, ১৯২৮ এবং ১৯৩০ সালে ঐ একই পদে ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি বেনারসে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ইতোমধ্যে ১৯২৯ সালে লর্ড হ্যাডেনের প্রস্তাবে রাধাকৃষ্ণণ অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজের প্রিন্সিপাল জে.ই. কারপেন্টারের স্থলাভিষিক্ত হন। এখানে তিনি শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক ধর্মের ওপর বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেওয়ার পর ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। এরপর তিনি ১৯৩১-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মদক্ষতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষা কার্যক্রম আরো গতিশীল করেন।

১৯৪১ সালে রাধাকৃষ্ণণ যখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাচার্যের পদে ছিলেন তখন তাঁর কাছে বরোদায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার জন্য স্যার সায়াজী রাও চেয়ার গ্রহণ করার অনুরোধ আসে। এই অনুরোধ আসার পর রাধাকৃষ্ণণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে রাজা পঞ্চম জর্জের পদ পরিত্যাগ করেন এবং বরোদার আমন্ত্রণে সাড়া দেন।

১৯৪৪ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে তিনি চীনে যান এবং চীনে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলির সংখ্যা ছিল বারোটি। এখানে তিনি বেশ কিছু বিদগ্ধ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর চীন দেশের বক্তৃতাগুলি *'India and China'* নামে একটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে ইউনেসকোর ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা হিসাবে নিয়োগ করেন। বহুবার তিনি ইউনেসকোতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে নেতৃত্ব দেন। এই বছরেই তাঁকে সান্মাসিক সদস্য পদ দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। নেতা হিসাবে ১৯৪৬-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। দেশ বিভক্তির সময় অন্য সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ভবিষ্যতে ভারত গড়ার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে চিন্তার রসদ জুগিয়েছিল।

১৯৪৮ সালে তিনি প্যারিসে ইউনেসকোর কার্যকর সমিতির চেয়ারম্যানের পদে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের কাজ শুরু করেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন রাধাকৃষ্ণণ। ভারতের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সঠিক পথ নির্দেশ করা এবং কিছু পরিবর্তন আনাই ছিল এই কমিশনের উদ্দেশ্য। রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে এই কমিটি দ্রুত কাজ করেছিল এবং ১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসেই তাঁদের প্রতিবেদন জমা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বছরই তদানীন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাধাকৃষ্ণণকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিয়োগ দেন। পশ্চিমবঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সাম্মানিক সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে।

রাধাকৃষ্ণণের জীবনে ১৯৫২ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছরেই তাঁকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং পৃথিবীতে তিনি একজন মহান দার্শনিক হিসাবে স্থান পান। এ বছরই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য তাঁকে মনোনীত করেন এবং তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে যে রাজ্যসভা গঠন করা হয়েছিল সেই রাজ্যসভার প্রথম চেয়ারম্যান হিসাবে ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাধাকৃষ্ণণ উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন রাষ্ট্রপতির পদে ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯৬১ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে কিছু দিনের জন্য রাধাকৃষ্ণণকে রাষ্ট্রপতির কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ১৯৬২ সালের ১১ মে রাধাকৃষ্ণণ ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির পদে কাজ করেন।

১৯৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর থেকেই রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনের দিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ১৯৬৩ সালের ১১ জুন নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি রাধাকৃষ্ণণকে 'Doctor of Law' নামক সম্মান সূচক ডিগ্রি প্রদান করে। রাধাকৃষ্ণণ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৯৬৭ সালে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি জাতির উন্নয়নে কাজ করে যান। তাঁর জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ ভারতীয়দের প্রেরণা ও চিন্তার উৎস। স্বাধীনতার পর যখন দেশ গড়ার কাজ শুরু হয় তখন রাধাকৃষ্ণণের ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতা দেশের মানুষের মনে একটা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অবসর গ্রহণ করার পর তিনি মাদ্রাজে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। এরপর তিনি অনেক গ্রন্থ লেখেন এবং আমৃত্যু কাজটি চালিয়ে যান। ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁর শরীরের ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। অসুস্থ অবস্থায় নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার পর তিনি ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টেমপ্লেটন পুরস্কার পান। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পুরস্কার পেলেন অথচ তিনি খ্রিস্টান নন। ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১। ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৪, পৃ-৯।

২। পূর্বোক্ত,পৃ-১৩।

৩। নিখিল ভট্টাচার্য্য, *হিন্দুধর্মের রূপরেখা*, মূল: ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, মুদ্রণবিদ কম্পিউটার অ্যান্ড অফসেট প্রিন্টার্স, কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল, ঢাকা, ২০১৫, পৃ- ২১।

৪। S. Radhakrishnan, *President Radhakrishnan's Speeches and Writings* (May 1962-May 1964), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, p-114.

৫। S. Radhakrishnan, *Occasional Speeches and Writings* (July 1959 – May 1962), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, p-195.

৬। S. Radhakrishnan, *President Radhakrishnan's Speeches and Writings* (May 1962-May 1964), Publication Division, Ministry of Information and Broad Casting, Govt. of India, p-135.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণণের দর্শনচিন্তা

২.১ দর্শন

২.২ গতিশীল ব্রহ্মবাদ

২.৩ বুদ্ধি ও অপরোক্ষানুভূতি

২.৪ সভ্যতার সংকট

২.৫ রাজনৈতিক দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

রাধাকৃষ্ণণের দর্শনচিন্তা

২.১ দর্শন

রাধাকৃষ্ণণ বহুদিন খ্যাতির সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শনাচার্য হিসাবে কাজ করেন। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যধর্ম বিষয়ে স্থায়ী অধ্যাপক পদে যোগ দেন। রাধাকৃষ্ণণের বাগ্মিতাও অনন্য সাধারণ। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের মৌল নীতিগুলো হলো:

ক. বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

খ. দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা

গ. আধ্যাত্মিকতা

ঘ. মানবতাবোধ

রাধাকৃষ্ণণ প্রধানত *'ভারতীয় দর্শন'* গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে পরিচিত হলেও অন্যান্য দার্শনিক ও ধর্মমূলক গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। যৌবনে তিনি সাম্প্রতিক দর্শনে ধর্মের রাজত্ব *(The Reign of Religion in Contemporary Philosophy)* নামে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচনা করে সুধী সমাজে পরিচিত হন। তাঁর ভারতীয় দর্শন (দুই খন্ড) ভারতীয় চিন্তাধারার সম্যক পরিচয় দিয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন করে তোলে। এ ছাড়া তিনি *'কল্কি'* অথবা *'সভ্যতার ভবিষ্যৎ'*, *'প্রাচ্যধর্ম ও পাশ্চাত্য'* চিন্তাধারা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেও প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য-উভয় দর্শনেই সুপণ্ডিত। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের নব্য-হেগেলপন্থী স্টারলিং, কেয়ার্ড, গ্রিন, ব্রাডলি, বোসাঙ্কয়েট প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। হিন্দু ষড়দর্শনের ভিতর রাধাকৃষ্ণণ শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্তের ভক্ত। একদিকে তাঁর দর্শন চিন্তায় রয়েছে ব্রাডলির প্রভাব, অন্য দিকে শঙ্করাচার্যের ভারতের প্রাচীন দর্শনের মর্মবাণী তিনি যেমন একদিকে গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'অভিনব বিকাশবাদ' (Emergent Evolution) এর মূলতত্ত্ব ও তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে। বিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও মরমী সাধকদের কাহিনী ঘেঁটে তিনি গড়ে তুলেছেন এক 'গতিশীল ব্রহ্মবাদ'- যার আকর্ষণ অনেকের কাছেই অনস্বীকার্য।

ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি সশ্রদ্ধ অভিবাদন পেয়েছেন তাঁর কারণ জীবনের সমস্যাকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন এক অসাম্প্রদায়িক, ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে সমন্বয়ের তত্ত্বকথা প্রচার করেছেন, জীবনকে অস্বীকার করে শুধুই আকাশকুসুম রচনা করেননি। তিনি বলেন:

> "Philosophy must be systematic exposition of the content and implications of religious experience."[১]

বর্তমান যুগটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রসভ্যতার যুগ। এই সভ্যতা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মা বা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেনা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং এদের পরস্পর সম্বন্ধেও বিশ্বাস রাখে না। রাধাকৃষ্ণণের মতে বুদ্ধি ও অনুভূতির মধ্যে বুদ্ধি দিয়ে বস্তু বিচার করতে হবে। তখন দেখা যাবে যে এই নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবাদী যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে গভীরে একটি মিল আছে। সত্যকে আবিষ্কার ও জীবনে প্রতিফলিত করাই প্রাণের ধর্ম। এ থেকেই আসে প্রাণে-প্রাণে, বিষয়ে-বিষয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পর সহযোগিতা। এই বোধ থেকে জন্মলাভ করে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। বিবেকানন্দের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বৈদান্তিক ব্যাখ্যার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণণের অনেকটা মিল আছে।

রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা এবং মানবাত্মা বা জীবাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের মধ্যে আত্মা বিরাজিত। অন্তরাত্মার উপস্থিতিটি উপলব্ধি করার সাধনাই প্রত্যেক মানুষের কতর্ব্য। এতে আত্মবিশ্বাস জন্মায়। আত্মবিশ্বাস জন্মালে ক্রমে আত্মবিদ হওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন- "মন্ত্রবিদ হলেই চলেনা, মানুষকে আত্মবিদ হতে হয়।"[২] অন্তর্লোকে যিনি যতখানি আত্মবিদ বর্হিজগতে তিনি ততখানি সফল মানুষ। আত্মসাক্ষাৎকারই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার। নিজের অন্তরে আত্মারূপী যে ঈশ্বর বিরাজ করেন তাঁকে উপলদ্ধি করতে হবে।

২.২ গতিশীল ব্রহ্মবাদ

উপনিষদের মূল কথা হল যে পরমাত্মা সর্বভূতে বিরাজিত। এই পরমাত্মাকে (Universal Spirit) দেখা, শোনা, মনে মনে চিন্তা করা, ধ্যান করা-প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের মূল কথা। উপনিষদের মতে প্রতিটি বস্তু বা পদার্থ আত্মা (Spirit) ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সমস্ত প্রাণী ও পদার্থের সুক্ষ্মতম কারণ এই পরমাত্মা এবং এটাই একমাত্র সত্যবস্তু। অবশ্য উপনিষদে আছে যে যদিও অনেকে মনে করেন অন্নই

Dhaka University Institutional Repository

ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুই একমাত্র সত্য বস্তু, তবুও এটা পরমতত্ত্ব নয়। ঠিক সেরকম-প্রাণই ব্রহ্ম বা মনই ব্রহ্ম, এমন কি বিজ্ঞানই (Self-Consciousness) ব্রহ্ম, এ সমস্ত কথাও বিভিন্ন অধিকারী বেলায় গ্রাহ্য হলেও, আসলে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম হলেন এমন একটি তত্ত্ব যিনি অনাদি, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয় চৈতন্য স্বরূপ, আনন্দ দিয়ে যিনি ঘেরা-যাকে জানলে এই দৃশ্যমান জগতের সব কিছু জানা হয়ে যায়, সব কিছুরই প্রাপ্তি ঘটে অজ্ঞাত, অপ্রাপ্ত আর কিছু থাকে না।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের এই বুনিয়াদ থেকেই তাঁর আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন যে, অন্ন প্রাণ মন, বিজ্ঞান, আনন্দ এ সব কিছুই এক পরমাত্মার, ব্রহ্মের প্রকাশ। অন্নে ব্রহ্ম প্রকাশিত। তবে প্রাণের স্তরভেদ ঘটছে; প্রাণের লীলাচাঞ্চল্য ব্রহ্ম প্রকাশিত হচ্ছেন উন্নততর, সভ্যতরভাবে। মনের স্তরে ব্রহ্মের প্রকাশ আরও উন্নত, প্রকৃষ্ঠ ধরনের। এভাবে অন্ন (Matter), প্রাণ (Life), মন (Perceptual Consciousness), বিজ্ঞান (Self Consciousness) এবং আনন্দ এসবের মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশিত। যদিও প্রকাশের তারতম্য অনুযায়ী জগতে অভিনব, বিচিত্র সত্তার প্রকাশ, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে, এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে জগতের ক্রমাভিব্যক্তি।

রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *'ভাববাদী জীবনবেদ'* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, বস্তুবাদকে গ্রহণ করা চলে না। আগেকার আমলের বস্তু (Matter) ছিল স্থিতিশীল অনড় পদার্থ। আজকের দিনে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের দৌলতে বস্তুর এ চেহারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। বিজ্ঞানের মতে *'বস্তু'* আসলে শক্তি বা ক্রিয়াশীলতার এক বিশেষ অভিব্যক্তি। তাছাড়া স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ বস্তুসত্তাও অলীক কল্পনামাত্র। কাজেই আজকের বিজ্ঞানের দৌলতে বস্তুবাদের যান্ত্রিক, নিশ্চল স্থিতিশীল জগৎ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এক নতুন গতিশীল, সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুজগতকে আজকাল দার্শনিকেরা বিচার করছেন। রাধাকৃষ্ণণ দেখিয়েছেন যে, বস্তু আসলে সৃজনশীল (Creative)। জগতে সৃজনশীল অগ্রগতির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। বস্তু থেকে প্রাণের আবির্ভাব। কিন্তু প্রাণের স্তরে ধারাবাহিকতা, অংশ এবং অংশীর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, সুষমা এবং সামঞ্জস্য এমনিই অভিনব যে প্রাণহীন জড়শক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা কোনক্রমেই চলে না। জীববিজ্ঞান জীবনের প্রসঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও, 'জীবনের উৎপত্তি', 'ক্রমবিকাশের রহস্য' সম্পর্কে একেবারেই নীরব।

চৈতন্যের আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন আবার নতুনের সঙ্গে, অভিনবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ মেলে। এই অভিনব গুণের ব্যাখ্যা শুধু জড়ের চাবিকাঠি দিয়ে বা প্রাণের চাবিকাঠি দিয়ে সম্ভব নয়। রাধাকৃষ্ণণ তাই বলেন- চৈতন্য যখন প্রাণ বা জীবনের স্তর থেকে উদ্ভূত হল, তখন চৈতন্যতো প্রাণের মতই বাস্তব সৎ। অথচ এ স্তরে আমরা পেলাম এক অভিনব সাক্ষাৎ যা প্রাণের চাইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আত্মসচেতন মানুষ যখন আবির্ভূত হল পৃথিবীতে তখন চৈতন্যের গুণগত পরিবর্তন ঘটল। কারণ প্রাণীর চৈতন্যে মানুষের আত্মসচেতনার সঙ্গে এক নয়। মানুষ প্রকৃতির সন্তান একথা ঠিক, কিন্তু বিবর্তনের ধারায় যখন মানুষের আবির্ভাব, তখন উল্লম্ফনের ভঙ্গিতে যেন বিবর্তনধারা একটা সম্পূর্ণ নতুন স্তরে এসে পৌঁছল। মানুষে আমরা পেলাম জৈব ধর্মের সঙ্গে ভাগবত সত্তার সংমিশ্রণ। বিজ্ঞান এই অপরূপ রূপান্তরের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারে না। রাধাকৃষ্ণণ ধর্মের দিক থেকে দর্শনের সমস্যা আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি হলেন সমন্বয়ীবাদী। তাই তিনি শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ব্রাডলির ব্রহ্মবাদ থেকে উপাদান আহরণ করে নিজস্ব ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

রাধাকৃষ্ণণ শঙ্করের ভক্ত হলেও শঙ্করের মায়াবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। জগৎ মূলতত্ত্ব নয়, নিশ্চয়- জগৎ পরব্রহ্মেরই ছায়ামাত্র। কিন্তু তাই বলে ব্রহ্মে জগৎ বাধিত বলা শঙ্করের এ মত তিনি স্বীকার করেন না। বরং ব্রাডলির পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলেন যে, ব্রহ্ম হল মূল সত্ত্বা, জগৎ আশ্রিত সত্ত্বা- রাধাকৃষ্ণণ একথা মানেন। তবে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেন যে, জাগতিক ঘটনাসমূহ পারমার্থিক তত্ত্ব না হলেও এরা কোন ভাবে ব্রহ্মাশ্রিত এবং ব্রহ্মসত্তায় সংরক্ষিত।

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে মরমী সাধকের অপরোক্ষানুভূতিতে যে তত্ত্বটি ধরা পড়ে সেটি হলে নির্গুণ ব্রহ্ম। আর ভক্ত যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ পান, সেটি হল সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। শঙ্কর বলতেন যে, ঈশ্বর পরমতত্ত্ব নয়, ঈশ্বর হল বুদ্ধিগম্য ব্যবহারিক সত্তা। ভক্তের কাছে সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সার্থকতা আছে কিন্তু সগুণ ব্রহ্মও পরমতত্ত্ব নন। অন্যদিকে রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, রামানুজ যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কথা বলেছেন সেটি আসলে ব্রহ্মই নয়, আসলে সেটি হল ঈশ্বর। রাধাকৃষ্ণণের মতে এ মত দুটির বিরোধের কোন কারণ নেই। নির্গুণ ব্রহ্ম হল আসল পরমতত্ত্ব, সাধকেরা যাঁরা দর্শন পেয়ে ধন্য হন; আর সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হল বুদ্ধিগম্য পরমতত্ত্ব, ভক্ত-হৃদয়ে যার অধিষ্ঠান। অবশ্য শঙ্কর, রামানুজ উভয়ের থেকে রাধাকৃষ্ণণের পার্থক্য আছে। রাধাকৃষ্ণণের মতে ব্রহ্ম নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়তত্ত্ব নন, ব্রহ্ম হলেন গতিশীল,

Dhaka University Institutional Repository

আত্মপ্রকাশশীল। ব্রহ্ম নিজেকে ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে প্রকাশিত করে চলেছেন। এই আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন স্তর হল জড়, প্রাণ, মন, প্রভৃতি সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

২.৩ বুদ্ধি ও অপরোক্ষানুভূতি

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনের গঠনে অনেকখানি পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্যের মনীষীরা বিজ্ঞান, তর্ক এবং মানবতার পুজারী। কিন্তু ভারতীয় চিন্তা নায়কেরা তর্কের উপর বেশি জোর দেননি। তাঁদের মতে বুদ্ধি অতিক্রমী কিন্তু বুদ্ধির চাইতে দৃঢ় ও শক্তিশালী হল বোধ বা স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষানুভূতি (Intuition) যা দিয়ে সৎ বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ভারতীয় দার্শনিকেরা তাই দর্শনকে শুধু জ্ঞানের কথা বলে চিত্রিত করেননি, অন্তর্দৃষ্টির কথা বলেই চিত্রিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বলেন জ্ঞান উৎপত্তি হয় তিনভাবে– প্রত্যক্ষ, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তন ও অপরোক্ষানুভূতি বা সাক্ষাৎ প্রতীতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এসবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বিশ্লেষণ ও নৈয়ায়িক জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে এবং এ জ্ঞানের সাহায্যে পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু এই উভয়বিধ জ্ঞানই পরমতত্ত্বকে জানবার দিক থেকে অসম্পূর্ণ। ব্রাডলি, বার্গসঁ-এঁরাও এ ধরনের অপারোক্ষানুভূতির কথা বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, শুষ্ক ন্যায়ে পরমতত্ত্বটি ধরা পড়ে না; অথচ সমগ্র মানব সত্তাটি যখন তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, অন্তর্দৃষ্টি যখন খুলে যায়, তখন তত্ত্বদর্শন ঘটে, যে দর্শনটাই মুখ্য কথা, নৈয়ায়িক জ্ঞানটা (logical knowing) নয়।

রাধাকৃষ্ণণ বুদ্ধি ও বোধের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন, বুদ্ধি হল ব্যবহারিক উপকরণ। বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, যদিও বুদ্ধি সত্যের সাক্ষাৎ পায় না। আবার বোধি যদিও সত্যের সাক্ষাৎ পায়, তবুও প্রয়োজনের দিক থেকে এর বিশেষ গুরুত্ব নেই। বোধি হল পরাজ্ঞান, সারসত্যের দর্শন। তিনি বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে বিরোধ স্বীকার করেন না। বোধি হল বুদ্ধির পরিণত অবস্থা, যুক্তিবিরোধী অবস্থা মোটেই নয়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, দর্শনের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিই আসল কথা। কারণ মহৎ সত্য প্রমাণের বিষয় নয়, সাক্ষাৎ প্রতীতিরই বিষয়। তাঁর মতে দর্শনের ক্ষেত্রে বোধির প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিজ্ঞান মনে করে যে বিশ্বজগৎ সুশৃঙ্খল, নিয়মের জগৎ অথচ এ বিশ্বাস তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বৈজ্ঞানিকের উপলব্ধির, সাক্ষাৎ প্রতীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তেমনি

Dhaka University Institutional Repository

তর্কশাস্ত্রে, নীতিশাস্ত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, জীবন নিরর্থক, তুচ্ছ নয়। অথচ তর্ক দিয়ে একথাটা প্রমাণ করবার উপায় নেই। কাজেই তর্ক অতিক্রমী, তর্কের প্রধান দার্শনিকেরা এ ধরনের ক্ষমতা স্বীকারও করেছেন।

দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ মানুষকে ভোগের ও বস্তুজগৎ থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হবার কথা বলেছেন। আত্মশক্তি ও ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা বলেছেন। আত্মদর্শনের কথা বলেছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। তাইতো তিনি বলেন,

> "The great religious tradition of India which has had a continuous life from the seers of the upanishads and the Buddha to Ramkrishna and Gandhi, may perhaps help to reintegrate this buried, battered and broken world and give to it the faith for which it is in search."[৩]

রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন অদৃষ্টবাদী। কিন্তু যুক্তিহীন, কর্মহীন ভাগ্যবাদের আলস্যে বিশ্বাসী ছিলেন না। কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে; যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কার্যকারণ সম্বন্ধগুলিকে চিনতে হবে। সত্যনিষ্ঠ ও সচেতন হয়ে সকল বিষয়ের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে। সৎ নিষ্ঠাবান কুশলকর্মী হয়ে নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তখন দেখা যাবে একটি অদৃশ্য পরমাশক্তি মানুষকে ক্রমে ক্রমে উন্নতির সিঁড়িগুলি পার করে দিচ্ছে। এই পরমাশক্তিকেই তিনি 'ভাগ্য' বলেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, কর্মে নিষ্ঠা, আচরণে সততা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস প্রয়োজন। এই গুণগুলি থাকলে জগতের সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। নিজেকে জানার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অদৃশ্য পরিচালিকা শক্তিকে জানা যায় এবং এই শক্তিটিকে অন্তরে উপলব্ধি করা যায়। একেই বলে আত্মদর্শন। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই মনুষ্যত্ব। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই দার্শনিক পথের কথাই বলেছেন। তিনি বলেন,

> "Hinduism is a movement, not a position, a process, not a result, a growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any

> emergency that the future may throw up, whether on the field of thought or history."[৪]

রাধাকৃষ্ণণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ভাগ্যবাদী, আত্মবিদ-সত্যসন্ধানী দার্শনিক। কিন্তু তিনি জীবনের অথবা দর্শনের পথকে ঘৃণা করেননি বা তাকে দূরে সরিয়েও রাখেননি। তাঁর রাশিয়ায় অবস্থান কালের ঘটনাবলি এবং উপরাষ্ট্রপতিরূপে মাও সে-তুং ও চু এন লাই এর কমিউনিস্ট চিন দেশ ভ্রমণ এর উদাহরণ। উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ রাধাকৃষ্ণণের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণণও তাঁদের নেতৃত্বকে মানবতাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। সকল ধর্মমত ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া একটি আদর্শ মানবিক গুণ। ঘৃণা বা হিংসা নয় পরস্পর ভালোবাসার সঙ্গে সহাবস্থান বর্তমান জগতের রাজনৈতিক দর্শন। রাধাকৃষ্ণণের দর্শন থেকে একথাও আমরা জানতে পারি।

২.৪ সভ্যতার সংকট

রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, ধর্মের বিকাশ কোন ব্যবস্থায় মানবাত্মার মুক্তি নেই। থিওসফি বল, খ্রীস্টান বিজ্ঞান (Christian Science) বল, মানবতাবাদ, সমাজতন্ত্র, নব্যপন্থা, সাম্যবাদ যাই বল না কেন, এর কোনটাই গোটা মানুষটিকে আনন্দ দিতে, তৃপ্তি দিতে পারে না। জগতের চারদিকে আজ অনিশ্চয়তা ও আধ্যাত্মিকতা শূন্যতা। নৈতিক কোন আদর্শ আজ আর নেই। মানুষের চারদিকে আজ অনিশ্চয়তা ও আধ্যাত্মিকতা শূন্যতা। নৈতিক কোন আদর্শ আজ আর নেই। মানুষ আজ তাই চারিদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে খুঁজে ফিরছে পথ। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, নিরাশার কারণ নেই। কারণ, মানবজাতি এখনও নবরূপ ধারণ করছে। আজ যদি আমরা আবার উচ্চ আদর্শ, উন্নত সংকল্প নিয়ে, সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হই, তবে অচিন্তিতপূর্ব স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধান আমরা পেতে পারি। আজ তাই আমাদের প্রয়োজন মানুষের অন্তরস্থিত ভগবানের আহ্বান, বক্তৃতা, কর্মসূচি ইজম-এ সব নয়। আজকের দিনে মার্কসবাদ পৃথিবীর জনসাধারণের চিত্ত ক্রমশ আকৃষ্ট করছে। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *Religion & Society* গ্রন্থটিতে 'মার্কসবাদ' নিয়েও আলোচনা করেছেন।

মার্কসবাদীরা শুধু অন্নবস্ত্র, ঐহিক উন্নতি নিয়ে মাথা ঘামায় অথচ রাধাকৃষ্ণণের মতে ঐহিক উন্নতির উপকরণমূল্যই শুধু আছে, চরমমুল্য নেই। তাছাড়া, মানুষের জীবন-জীবিকা, অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেমন আছে, তেমনি সত্য শিবম সুন্দরের প্রতি আকর্ষণও আছে-ধর্মবোধের প্রশ্নটাও তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাধাকৃষ্ণণ বলেন, মার্কসবাদীরা যে ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন সে শুধু ধর্মের বহিরঙ্গ দেখে, প্রকৃত ধর্মের রূপ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন নন; তাই ধর্মের সারবস্তুকে না দেখে, খোলসটি নিয়েই তাঁদের সমালোচনা। তাছাড়া মার্কসবাদীরা একদিকে বলেন যে, চরম সত্য বলে কিছু নেই, অথচ তাঁরা সমষ্টিকল্যাণ ও অন্যান্য সামাজিক শ্রেয়কে সনাতনের সিংহাসনে বসিয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "আমাদের এই যুগে আত্মাকে আমরা হারিয়েছি। দেহ আমাদের বিকল হয়নি। অন্তরস্থিত পুরুষটি আজ রোগাক্রান্ত, সব দুঃখেরই উৎপত্তি সেখান থেকে। আজ সংকট উত্তরণের পথ হল 'আত্মাকে জানা', ধর্মের বিশেষ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা যাতে মানুষ, মনের পরিবর্তন করে নিখিল বিশ্বের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে, পৃথিবীর বুকে নেমে আসে স্বর্গের সুষমা ও শান্তি।"[৫]

রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে ইংরেজি পরিভাষায় যে উদার, অসাম্প্রদায়িক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন খাড়া করেছেন তাঁর আকর্ষণ শিক্ষিত ভারতীয় সমাজে অনেকখানি। তবে দর্শনতো শুধু পুরাতনের 'নতুন ব্যাখ্যা' নয় দর্শন হল মতাদর্শগত সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ যা দিয়ে জনতার সংগ্রাম মুখর জীবন আলোকিত হয়ে ওঠে। অথবা যা দিয়ে বাস্তব সমস্যা, বাস্তব সংকটের চেহারা দার্শনিক আবৃত করে রাখেন। সভ্যতার সংকট উত্তরণে রাধাকৃষ্ণণের দর্শন আলোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

(১) রাধাকৃষ্ণণ দর্শন ও ধর্মকে এক করে দেখেছেন। তাঁর মতে দর্শনের বিষয়বস্তু হল ধর্মভাব; ভক্তদের অভিজ্ঞতা বিচার-বিশ্লেষণ-ধর্ম ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতার নবমূল্যায়ন, এ ছাড়া দর্শনের আর কোন কাজ নেই। অথচ আজ দর্শনকে বিজ্ঞানের স্তরে না তুলতে পারলে, দার্শনিক হেঁয়ালীপনারই প্রশয় দেবেন, নতুন জগতের উদগাতা হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা পাবেন না।

(২) বিজ্ঞান নিয়ে রাধাকৃষ্ণণ যেটুকু আলোচনা করেছেন সেটুকু সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাবার জন্য। ফলে, পুরনো প্রাক-বৈজ্ঞানিক আমলের ধর্মীয় চিন্তাধারার জের টেনেই তিনি চলেছেন, বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তব মূর্ত পৃথিবীর দর্শন আলোচনা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) রাধাকৃষ্ণণ এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যা পরীক্ষা নিরীক্ষার বাইরে। সগুণ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ও ঈশ্বর, ঈশ্বর ও জীব, জীবের মুক্তি, এ সব প্রশ্ন সাবেকী দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও আধুনিক কালের ভারতীয় দার্শনিক বদ্ধজলায় আবদ্ধ থাকবেন এমন অর্থ নেই। অথচ রাধাকৃষ্ণণ তাঁর অসামান্য প্রতিভা নিয়ে নতুন সজ্জীবনী মন্ত্রের সন্ধান দিতে পারলেন না। ধর্ম নামে যে ভ্রমাত্মক সূর্যের পিছনে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে, তার পিছনেই ছুটে বেড়ালেন।

(৪) রাধাকৃষ্ণণের দর্শন ভাববস্তুকে প্রগতিশীল বলাও চলে না। কারণ, ভারতবর্ষের যে সব পরিস্থিতি মানুষকে পতিত, দাস, ঘৃণাসম্পদ ও উপেক্ষিত প্রাণিতে পরিণত করেছে সেগুলিকে নিঃশেষ করবার দার্শনিক আহ্বান তিনি জানাননি। আধ্যাত্মিক সত্যের জায়গায় পার্থিব জীবনের সত্য স্থাপন করা রাধাকৃষ্ণণের উদ্দেশ্য নয়। তাই তিনি আমাদের বাস্তব শক্তিকে যে বদলাতে হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপান্তর ছাড়া যে মানবতার উদ্ধারের আশা নেই-এসব কথাকে গুরুত্ব দেননি। রাধাকৃষ্ণণের বাণী হল, "অন্তরস্থিত পুরুষটিকে জান, ধর্মের বিশেষ শক্তিটিকে জাগিয়ে তোল"[৬]–তবেই সব সমস্যার সমাধান।

(৫) সাবেকী দার্শনিক মহলে ধারণা আছে যে কর্মমুখর সমাজজীবন নয়, নিঃসঙ্গতায়ই শুধু আনন্দ। এসব দার্শনিকেরা নৈর্ব্যক্তিক সত্য শিব সুন্দরের উপাসক, রাজনীতির চাইতে আত্মোপলব্ধি-প্রার্থনা-এ সব এঁদের কাম্য। এঁদের দাবি হল, অন্তরের দিকে ফের, অন্তরস্থিত পরমপুরুষটিকে জানো ধ্যানযোগে। এরা বহির্জগতের দিকে, সমাজের দিকে, সমাজজীবনের সমস্যার দিকে মুখ ফেরাতে ভয় পান। এঁদের মতে সমাজ রূপান্তরের কথাটা বড় কথা নয়। জগৎকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, অপরোক্ষানুভূতি দিয়ে বোঝা, ভুমার উপলব্ধি করাটাই আসল প্রশ্ন। রাধাকৃষ্ণণ এই ভাববাদীদেরই একজন। এঁদের মতে, যতই নৈর্ব্যক্তিকতার, অবাস্তবতার স্তরে ওঠা যাবে, ততই পরমতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ ধরনের মতবাদের ফল এই যে, পণ্ডশ্রম ছাড়া এদের কোন গুরুত্ব নেই। এ মতবাদের সমর্থকেরা যা কিছু সুস্থ, যুক্তিসম্মত, বিজ্ঞান সমর্থিত তার থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ ফিরিয়ে নেন আর পরমতত্ত্ব সর্বভূতান্তরাত্মা নামে আলেয়ার পিছনে ছোটেন। সমাজ সংস্কারের যতকিছু কর্মপন্থা ও আন্দোলন শেষ

পর্যন্ত সে সব আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁরা যোগ রাখতে পারেন না ইতিহাসের রথকে, আটকে রাখাতেই তাঁদের সব প্রতিভা নিঃশেষ হয়।

শেষ কথাটা এই যে, আজকের দিনে বহিঃপ্রকৃতি ও সমাজজীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে তাতে বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে দর্শন আলোচনা না করলে সে দর্শনের সার্থকতা সামান্য। বিজ্ঞান দেখিয়েছে যে জগৎ স্থিতিশীল নয়, গতিশীল প্রবাহের মত। সমাজ জীবনের বেলায়ত্ত ঐ কথাই কথা। প্রকৃতির অন্তঃস্থলে সমাজ জীবনে বিরোধী সংঘর্ষ সমাগম-সাম্যবস্থা রয়েছে। কাজেই প্রকৃতির অন্তঃস্থলে, সমাজজীবনে বিরোধী-সংঘর্ষ, সমাগম-সাম্যবস্থা রয়েছে। কাজেই প্রকৃতিতে, সমাজে, নতুনের, অভিনবের আবির্ভাব। প্রকৃতির রাজ্যে, সমাজজীবনে, অস্পষ্ট পরিমাণগত পরিবর্তন সঞ্চিত হতে হতে, গুণগত মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তন যখন সাপের চলার মত ক্রমিক ধারায় বয়ে চলে, তখন একে বলি ক্রমবিকাশ; আর যখন পরিবর্তনের ধারা ব্যাঙের উল্লফনের মতো উৎক্রান্তির ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয় তখন এ পরিবর্তনকে বলি বিপ্লব।

২.৫ রাজনৈতিক দর্শন

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মূলত অধ্যাপক। শিক্ষকতাই তাঁর জীবনের ধর্ম। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ রচনাও ছিল তাঁর অন্যতম কাজ। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং ভারতীয় দর্শন ও হিন্দু ধর্মের ওপর গ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে আনে। তিনি এম.এ পড়ার সময়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শন সম্বন্ধে একটি গবেষণা পত্র রচনা করেন। মাদ্রাজে থাকার সময়ই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি রচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এ থেকে বঙ্গীয় বিদ্বান সমাজে তাঁর নাম ছড়ায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাঁকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকরূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থটি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জওহরলাল নেহেরু ছিলেন একজন রবীন্দ্র অনুরাগী। এই গ্রন্থটির সূত্রেই জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণণের পরিচয় ঘটে। উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দু-জনের বন্ধুত্ব গভীর হয়। রাধাকৃষ্ণণ যখন কলকাতায় তখন রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল নেহেরুর পরিচয়ের সূত্র ধরে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। মহাত্মা গান্ধি তাঁকে জাতিগঠনের আহ্বান জানান।

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীন দেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগানো একটি মহৎ কাজ; সুতরাং এই কাজে যোগদান করলে দেশমাতার সেবা করা হবে। মহাত্মা গান্ধির এই অভিমতটি তিনি রাধাকৃষ্ণণকে জানান এবং তাঁকে দেশের কাজে আহ্বান করেন। এভাবে রাধাকৃষ্ণণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। মহাত্মা গান্ধি তাঁকে ১৯৩৯ সালে পরাধীন দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠিয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় সত্তার মুক্তি ও শান্তির সনাতন বাণী প্রচারের জন্য মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণাঙ্গ পরাধীন নিপীড়িত দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে আত্মসচেতন করে তোলা। পরাধীন ভারতে রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতাগুলি এই সময় কেবল ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, ধর্ম ও দর্শনকে কেন্দ্র করে সকল প্রকার পরাধীনতার বন্ধন থেকে মানবাত্মার মুক্তির বাণী ঘোষণা করত। ফলে বুদ্ধিজীবী মহলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরোক্ষ সংবাদ এই বক্তৃতাগুলি প্রচার করত। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এই ঘটনাই ঘটেছিল। উত্তরপ্রদেশের গভর্নর তাঁর অধস্তন অফিসারকে রাধাকৃষ্ণণের এই ধরনের কাজ কঠোরভাবে জানিয়েছিলেন যে, রাধাকৃষ্ণণের কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ তিনি ইংরেজ জাতীয়সত্তার গর্বের বিষয় ব্রিটিশ আকাদেমি অব অল সোর্স এর শ্রদ্ধেয় সদস্য আর আপনি ব্রিটিশ উপনিবেশের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশের গভর্নর মাত্র। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা নানাভাবে উৎপীড়িত ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু রাধাকৃষ্ণণের জাতীয়তাবাদী কাজে কখনো বাধা আসেনি।

তাঁর মেধা ও জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা এমন ব্যাপক ছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ছোটো ইংরেজ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। স্বাধীনতা লাভের পর জওহরলাল নেহেরু তাঁকে রাশিয়াতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি স্ট্যালিন বিদেশের কোনো রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না কিন্তু রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দু'বার সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে একবার স্বেচ্ছায় রাধাকৃষ্ণণকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। উপরাষ্ট্রপতি পদে তিনি দশ বছর কাজ করেছেন। তিনি ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণণের রাজনৈতিক জীবনে কূটনীতিতে তাঁর বিচক্ষণতার অনেক প্রমাণ আছে। রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত থাকাকালে তিনি এই কমিউনিস্ট দেশে ভারতের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ওই সময় কোরিয়া বিভাজিত হয়। ভারত যেমন ভারত ও পাকিস্তান দুটি খন্ডে বিভক্ত হয়েছে কোরিয়া তেমনি উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বিভক্ত হয়। কোরিয়া সম্বন্ধে ভারত ও রাশিয়ার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। রাধাকৃষ্ণণ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিটি যথাযথভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন, ফলে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এ বিষয়ে কোন বিরোধ ঘটেনি।

উপরাষ্ট্রপতি পদে থাকার সময় রাধাকৃষ্ণণ প্রধানত জাতীয় জীবনে শিক্ষাক্ষেত্রটিকে সুগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনে বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা, শিল্পকলা ও সাহিত্যকে পরস্পরের প্রতিযোগী না করে সহযোগী করে তুলতে চেয়েছিলেন। টেকনোলজি ও বাণিজ্য বিজ্ঞানের অধ্যয়নের পথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশস্ত করেছিলেন। তিনি কলাবিজ্ঞান ও টেকনোলজিকে পরস্পরের সহায়ক সহযোগীরূপে দেখতেন। এই বিদ্যালয়গুলি এক একটি পৃথক পৃথক বিদ্যা বলে মনে করতেন না। উপরাষ্ট্রপতির পদে থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার তাঁর একটি প্রিয় কাজ ছিল।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন রাষ্ট্রপতি হলেন তখন ভারতের রাষ্ট্র জীবনে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ, চীনের ভারত আক্রমণ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যু ও লালবাহাদুর শাস্ত্রীর তাসখন্দে আকস্মিক মৃত্যু যখন ভারতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তখন সেই সংকটমুহূর্তে আমাদের দার্শনিক রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্ব দুঃসময়ে আলো এনেছিল। তিনি প্রত্যেকটি ঘটনার পরেই যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে সংকটের গভীরতা ও সংকটমুক্তির পথের কথা ছিল। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতা বিশ্বে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

তথ্যসূচি

১. S. Radhakrishnan, *An Idealist View of Life*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1929, p-97.

২. ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৪, পৃ-৩১।

৩. S. Radhakrishnan, *Religion & Culture*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1982, p-102.

৪. S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1928, p-129-130.

৫. S. Radhakrishnan, *Recovery of Faith*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1983, p-82.

৬. Ibid, p-85.

৩য় অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাদর্শন

৩.১ শিক্ষা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ

৩.২ শিক্ষায় ধর্মের স্থান

৩.৩ শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য

৩.৪ শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য

৩.৫ মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত

৩.৬ শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত

৩.৭ জাতির শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

৩.৮ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের ধারণা

রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাদর্শন

৩.১ শিক্ষা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার সময় বলেন যে, "শিক্ষা তাঁর একটি বিশেষ বিষয়।"[১] তিনি সেই কারণে তাঁর মন্তব্য এই ভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, সাধারণ মানুষ ভোগ্য পণ্য সংগ্রহ করার জন্য বা তাকে রক্ষা করার জন্য ব্যস্ত হয় এবং ভোগ্য বস্তু পেয়ে খুশীও হয়। তিনি মনে করেন যে, আমাদের নিজেদের উন্নতি অনেকটা আমাদের ওপরেই নির্ভর করে। যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং চেষ্টা করি আমাদের আত্মজ্ঞান, আত্মসতর্কতা, আত্মসমালোচনা করতে তাহলে ধীর পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে যেতে সমর্থ হব।

ড. রাধাকৃষ্ণণের কুসংস্কারমুক্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, কৌতূহল এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর জ্ঞান তাঁর চিন্তা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যখন তিনি দর্শনের শিক্ষক হিসাবে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছলেন তিনি তখন পরিষ্কারভাবে মুক্ত সমাজ সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করে বলেন, "একটি মুক্ত সমাজ হলো এমন একটি সমাজ যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বৌদ্ধিক জীবন ও আত্মিক মুক্তি দেয়।"[২]

তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য অভিজ্ঞতার দ্বারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা বা শিক্ষালাভ করা এবং আনন্দ অনুভব করা। শিশুর স্বাধীন বিকাশের জন্য এবং শিশুদের মধ্যে শক্তি সঞ্চায়ের জন্য তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে প্রাকৃতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যুব সমাজকে এমন ভাবে শিক্ষিত করা উচিত যে প্রয়োজনে তাঁরা সমাজের জন্য চিন্তা করবে এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্পর্শকাতর হবে। রাধাকৃষ্ণণের মতে, "সমাজের বা জাতির অগ্রগতি চরিত্রের উপর নির্ভরশীল"[৩]

তিনি সমাজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার উপাদান হিসাবে দেখেছেন। শিক্ষার নতুন মোড় যে প্রয়োজন তিনি তাঁর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক রাজ্যের একটি নৈতিক কর্তব্য। তাঁর নিজের কথায় বলা যায়,

"একটি রাষ্ট্রের উচিৎ জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা। এ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে আমরা যদি টিকে থাকতে চাই তবে আমাদের সক্ষম ব্যক্তিদের উপর অধিক

দায়িত্ব অর্পন করতে হবে। কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে চারদিকে নিয়োগ দিতে হবে। যেসব প্রতিবন্ধকতা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পীড়া দেয় তা যত দ্রুত সম্ভব দূর করতে হবে"[৪]

শিক্ষা মানুষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং অপর পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা সমাজের সকল দোষগুলিকে দূরীভূত করে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে। রাধাকৃষ্ণণের মতে, শিক্ষা মানুষের কর্মশক্তিকে সঞ্জীবিত করে। মানুষের মধ্যে সুক্ষ্ম অনুভূতি জাগিয়ে তোলে শিক্ষা। মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ আছে তাকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে শিক্ষা। রাধাকৃষ্ণণের নিজস্ব মতামত থেকে এ সম্পর্কে জানা যায়, "মানব জাতিকে অতি মানব হতে হবে। তার মধ্যে যে ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গ আছে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। এটা আমরা উপলব্ধি করি না এবং আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে এ ঐশ্বরিক শক্তি ও সম্পদ প্রত্যাখান করি। এটা ঐশ্বরিক শক্তির বিস্তৃতি এবং এ বিস্তৃতি এ পৃথিবীতে সকল প্রকার মর্মপীড়া ও হতাশার কারণ।"[৫]

সত্যকারের জ্ঞান মানুষকে আলোকিত করে; সেই কারণেই একটি বহুল প্রচলিত বাক্য আমরা গ্রহণ করেছি- সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। রাধাকৃষ্ণণের ব্যাখ্যা তাঁর নিজস্ব প্রবন্ধ থেকেই জানা যায়, "আধ্যাত্মিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে ভিতরে ও বাইরে এক করে তোলা এবং এতেই জীবন শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে।"[৬]

প্রকৃত জ্ঞান একটা সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারে। এই শিক্ষার দ্বারাই মানুষ চিন্তা করতে পারে তার নিজের প্রকৃতি সম্পর্কে এবং অবসর সময় কীভাবে সে এই শক্তিময় জগতে প্রবেশ করতে পারবে সেই সম্পর্কেও তাঁর ধারণা তৈরি হয়। প্রকৃত শিক্ষা অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়, আত্ম উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এর সাহায্যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে। রাধাকৃষ্ণণের মতে-
"অন্তর্দৃষ্টি হলেই এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি হয়। "[৭]

৩.২ শিক্ষায় ধর্মের স্থান

মানুষের স্বভাব চরিত্র বিষয়ক প্রত্যয় সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক। এই ধারণার ভিত্তিতে ড. রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করেন যে, মানব জীবনে ধর্ম হল একটা অপরিহার্য বিষয়। ধর্মই মানুষের মনে মূল্যবোধ জাগাতে

পারে। মানুষ যখন নিজের ধর্মকে ভুলে যায় যখন সে মানবিকতা থেকে বিচ্যুত হয় এমন সে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয়ে গোঁড়া ধর্মান্ধ হয়ে পড়ে।

আমরা যদি ধর্ম গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করি তার বিষয়বস্তু নিয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পারি ও অনুধাবনের চেষ্টা করি অথবা এসব নিয়ে যদি আলাপ-আলোচনা করি তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের মধ্যেকার দেবত্বের দ্বীপ্তি প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমাদের ভিতরকার সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হওয়ার পথ খোঁজে। তাই সকল শিক্ষারই উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্দৃষ্টি বিকাশে সাহায্য করা। যেন তারা ধর্মানুশীলন ও অনুধাবন প্রক্রিয়ায় নিজ নিজ অন্তরের সেই ঐশ্বরিক শক্তির সন্ধান পায় এবং তারা যেন নিজেকে জানতে ও চিনতে পারে। শ্রদ্ধার সঙ্গে সকল স্তরে ধর্মালোচনা, বিশ্বের প্রামাণ্য ও সবর্জনগ্রাহ্য গ্রন্থপাঠ, মহান ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভ ও তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা, ধ্যান বা গভীর চিন্তা ও অনুধাবনের প্রয়াস ইত্যাদি মানুষকে সহজে সত্যের অনুসন্ধানে নিমগ্ন করতে পারে। এসব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিপুঞ্জের বা সম্ভাবনারাজির সন্ধান দিতে পারে। এসব প্রয়াসের ভিতর দিয়ে মানুষ নিঃসন্দেহে আবিষ্কার করবে যে, বিশ্বের বহুবিধ ধর্মের প্রবর্তকদের মহান চিন্তা ও কর্মের ভিতর রয়েছে সত্যের সমন্বয়, অখন্ড জ্ঞানের অভিব্যক্তি।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বিজ্ঞানচর্চার ভিত্তি হল সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা। ধর্মানুসন্ধানেরও লক্ষ্য হল জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধান। সুতরাং ধর্ম ও বিজ্ঞান নিশ্চয়ই পরস্পরের শত্রু নয়। বিজ্ঞানচর্চাই পদার্থের শক্তি আবিষ্কার করতে পারে বিশ্ব প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ রীতি-নীতি, বিধি-বিধানের সন্ধান দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের ভিত্তি হল উৎসর্গের পাঠ চর্চা, গভীরতর অনুধাবন বা ধ্যান, পরীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ একান্ত নিষ্ঠাসিদ্ধ কর্মপ্রেরণা। ধর্মীয় আবিষ্কার, অনুসন্ধান ও অন্তর্দৃষ্টি ঠিক একই কর্ম পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই পরিচালিত হয়। উভয় ক্ষেত্রে মানসিক প্রবণতা সমগোত্রীয়-উভয়ক্ষেত্রে জানবার, বুঝবার, হৃদয়ঙ্গম করবার বিষয়বস্তু অন্তহীন অফুরন্ত। বিজ্ঞান চর্চা যেমন মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং চিন্তাকে ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে তোলে, তেমনি ধর্ম ও চিন্তা এবং অনুভূতি শক্তিকে আরও বিশুদ্ধ ও ক্রিয়াশীল করে তোলে।

ড. রাধাকৃষ্ণণ চান যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানচর্চা উভয় ক্ষেত্রেই মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সুখ-দুঃখের অংশীদারত্ব বা সহানুভূতি এবং ন্যায় বিচার কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করুক। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উন্নয়ন ঘটুক ঠিক একই উপায়ে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ধর্মানুশীলনও উৎসাহিত হোক। তবে ধর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কোন ধর্মকেই গ্রাহ্য করা হবে না। রাষ্ট্র নিশ্চয়ই কোন বিশেষ ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে অনুদান প্রদান করবে না। আবার শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোন ধর্মানুশীলনে বাধ্য করা হবে না।

৩.৩ শিক্ষার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থে শিক্ষা সম্পর্কে নানাভাবে নানা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সেইসব মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষা বিষয়ে ড. রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে নিম্নরূপ বিষয়গুলি উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত

তিনি শিক্ষাকে মন ও আত্মা বা প্রাণশক্তির (Mind and spirit) শিক্ষণ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে সেই শিক্ষাই সম্পূর্ণ শিক্ষা বলে অভিহিত যে শিক্ষা ছাত্রের মনে মানবিকতার স্বরূপ মুদ্রিত বা চিহ্নিত করে দেয়। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর মনে বুদ্ধির বিকাশ ঘটায় না, শিক্ষা মানুষের হৃদয়ের উপর প্রভাব ফেলে ও তার আত্মার বিশুদ্ধ ঘটায়। বুদ্ধিগত শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি সে হৃদয় ও আত্মার উপর প্রভাব ফেলতে না পারে। শিক্ষায় দয়া-মায়া, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবিক সম্ভাবনাগুলির বিকাশ সর্বদা কাম্য। কল্যাণকর কর্মসম্পাদনে এগুলোর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মানব জাতির কল্যাণই হল মানুষের শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত।

দ্বিতীয়ত

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে শিক্ষাই হল বিজ্ঞানভিত্তিক শক্তি (Scientific spirit)। তাঁর মতে শিক্ষা অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার উদ্ভাবক। এর মাধ্যমে যেমন কৌতূহল বৃদ্ধি পাবে তেমনি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের প্রবণতা নিয়ে মানুষ নতুন নতুন সৃষ্টি কর্মেও নিয়োজিত হবে। আমরা চাই গতানুগতিক

চিন্তার অবসান ঘটুক, তার পরিবর্তে কল্পনা ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটুক যেন শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন চিন্তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বিজ্ঞানসম্মত পঠন-পাঠনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। চিন্তার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পূর্বধারণা ও সংরক্ষণশীলতা অপসারিত হোক, তার পরিবর্তে আসুক এমন সুস্থ ও সাবলীল মানসিকতা যেন শিক্ষার্থী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও কর্ম থেকে উদ্ভূত নতুন নতুন ভাবধারাকে সহজে ও সানন্দে গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয়ত

ড. রাধাকৃষ্ণণ গণতন্ত্রের পক্ষে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের মনে মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে শিক্ষার ভূমিকা। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই স্বাধীন। তাই সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কাঠামোতে তার চিন্তা ভাবনা, ভাব প্রকাশ ও কর্মের স্বাধীনতা আছে। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যক্তির এই স্বাধীনতা বা যুক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া কর্তব্য এবং সেইমত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা উচিত। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ যাতে অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায় এবং মানুষ যাতে শিক্ষার মাধ্যমে বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে সেদিকেও রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে শিক্ষিত সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাভোগীরাই শিক্ষা-সুযোগ ভোগ করে আসছে। তাই ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সকলের জন্য শিক্ষার দ্বার খুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছেন। গণতন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষার এটাই হল মর্মকথা।

চতুর্থত

ড. রাধাকৃষ্ণণ আত্মসংযম প্রসঙ্গে শিক্ষার বিশেষ ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মানুষ কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিভাবে সে নির্বিচারে কোন কিছু গ্রহণ ও বর্জন থেকে বিরত থেকে নিজেকে বিরত করবে। সেই পথ নির্দেশ শিক্ষাতেই দিতে হবে। কৃত কর্মক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, বিচার-বিশ্লেষণ করে কর্ম-সম্পাদনে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এসবের জন্যে চাই ধর্ম ও আত্মসংযম। তাই শিক্ষার ভূমিকাই হবে শিক্ষার্থীকে ধৈর্য্যশীল ও সংযমী করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

পঞ্চমত

ড. রাধাকৃষ্ণণ মতে শিক্ষার্থীর মনটিকে উদার, শক্তিশালী ও উন্মুক্ত করে দেওয়াও শিক্ষার অন্যতম ভূমিকা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, ভারতে এমন সব বিদ্বান ব্যক্তি আছেন যাঁরা বহু বছর পড়াশুনা ও জ্ঞানানুশীলন করে মনের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা আর কোন নতুনভাব বা ধারাকে গ্রহণ করেন না এবং নতুন করে চিন্তাধারাকে বিন্যাস করতে পারেন না। অথচ ইতিমধ্যে অনেক ধারণা পুরাতন, গতানুগতিক ও সেকেলে হয়ে গেছে। তাই তিনি চান, আজকের যুবকরা যেন নিজের দেশের উন্নয়নের স্বার্থে বরাবরই অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা বজায় রাখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণধর্মী অংশটিকেই তারাই নির্বাচন করতে সক্ষম হবে এবং সেই অংশটিকেই তারা গ্রহণ করবে। কুসংস্কার, একগুঁয়েমি, অহঙ্কার ও গতানুগতিকতার অবসান তারাই যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকাই হবে প্রধান ও অপরিহার্য। মূল ভারতীয় ভাবধারা ও আদর্শের যে বিশেষ শক্তি ছিল তার প্রয়োগ আধুনিক যুগেও নিতান্ত প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা এমন হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা সত্যানুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে বজায় রাখতে পারি। আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রনা থেকে সেই আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্যের জ্ঞানই আমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, উৎসাহী শক্তিশালী নাগরিক আছে, এসব থাকা সত্ত্বেও আমরা দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম নয়। আমাদের দেশের বৃহৎ অংশের মধ্যে অজ্ঞনতা ও শিক্ষাহীনতা বর্তমান। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উন্নতমানের নয়। একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ সমাজ তৈরি করতে গেলে সাধারণ মানুষকে আত্মসচেতনবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ যেন সহধর্মিতা ও সামাজিক বিচার সমভাবে পায় এ বোধ জাগাবে শিক্ষা, সেই কারণে আমাদের দেশের সব মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো জাগাতে হবে। একটি আদর্শ সমাজ নতুন করে গড়ার জন্য আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শিক্ষার প্রয়োজন। এমন সমাজ গঠন করতে হবে যে সমাজ কেউ অশিক্ষিত থাকবে না এবং তাদের নৈতিক শিক্ষা থাকবে।

৩.৪ শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য

কোনটি ভুল কোনটি সঠিক এই পাথর্ক্য মানুষ শিক্ষার দ্বারাই উপলব্ধি করতে পারে। শিক্ষার দ্বারাই মানুষ বুঝতে পারে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কোন সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করবে। এই ভাবেই মানুষ তার

সামাজিক লক্ষ্যে পৌঁছাবে। সুস্থ সাংস্কৃতিক প্রশাসনই জাতির শক্তি। একটা জাতিকে উপরে তুলতে পারে তারা যে জাতি সংস্কৃতিবান হতে পেরেছে এবং সুনাগরিক গড়তে পেরেছে। জাতীয় আদর্শ মহিমান্বিত হয় সংস্কৃতির দ্বারা। রাধাকৃষ্ণণ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,

> "A nation is built in its educational institutions.... if our institutions give our young men and women character and democratic discipline, the future of our country is safe."[৮]

উপর্যুক্ত শিক্ষার অভাবেই আমাদের নাগরিকত্ব বোধ গড়ে ওঠে না। সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না। কারিগরি নৈপুণ্যকে উন্নত করতে আমরা অনেক আগ্রহী কিন্তু মানুষের আসল গুণগুলি অর্জন করার থেকে আমরা অনেক দূরে থাকি। সমাজের প্রকৃতি ও নিয়তিকে জানতে সাহায্য করে শিক্ষা। মানুষের মধ্যে যে শূন্যতা আছে তা কখনই অর্থনৈতিক বন্ধন বা রাজনৈতিক স্লোগান দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। মানুষকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে পারলেই সমাজের উন্নয়ন সম্ভব। সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্বন্ধে বংশ পরম্পরায় পরিচিত হতে হবে তবেই সমাজের সংস্কৃতিকে ধরে রাখা সম্ভব হবে।

৩.৫ মহিলাদের শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত

মেয়েদের সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, সুতরাং ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও সমানভাবে শিক্ষা প্রদান করা উচিত। মেয়েরা একটা আদর্শ সমাজ গঠন করতে সহায়তা করবে সেই কারণে প্রত্যেক রাজ্যের উচিত মেয়েদের শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া। মেয়েরাই আমাদের সংস্কৃতির প্রকৃত অভিভাবক। প্রাচীন যুগের মেয়েদের শিক্ষা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণের যে বক্তব্য পেশ করেছেন তা হল, "অতীতে, আমাদের মেয়েদের উপনয়ন অনুষ্ঠান ছিলো যা তাদের জন্য পালন করা হতো। তাদের গায়ত্রী জপের অধিকারও ছিলো। মেয়েদের জন্য এসকল কিছুই উন্মুক্ত ছিলো। কিন্তু আমাদের সভ্যতাকে অতিগ্রস্ত করা হয়েছিলো এবং এর একটি প্রধান লক্ষণ হলো আমাদের মেয়েদের পরাধীনতা। মেয়েদের শিক্ষা প্রয়োজন যাতে করে আমাদের মেয়েরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রে সমান বিবেচিত হয়।"[৯]

রাধাকৃষ্ণণ মেয়েদের মুক্তির পক্ষে ছিলেন। মেয়েরা পুরুষদেরই সমকক্ষ, তাদেরও ব্যক্তিত্ব আছে, পদমর্যাদা আছে, মেয়েরা পুরুষদের শুধুই সঙ্গ দেয় এমন নয়। বর্তমান যুগ কারিগরি নৈপুণ্যের যুগ এবং মনোবিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার এই শতাব্দীতেই হয়েছে এবং হচ্ছে, সুতরাং এখন মহিলারা স্থবির জলের মত বাড়িতে বসে দিন কাটাবে তা হতে পারে না।

সমাজের ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের সমানভাবে চলা উচিত। মেয়েরাও স্বপ্ন দেখে এবং জাতীয় জীবনে অংশগ্রহণ করে। মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার অর্থ একটি জাতিকে আরও বেশি শক্তিমান করে তোলা, জাতীয় সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করা এবং নাগরিকতাকে সুদূর প্রসারী করা।

রাধাকৃষ্ণণ মহিলাদের পদমর্যাদাকে উন্নত করতে এবং মহিলাদের নৈতিক উৎকর্ষকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের ওপর জাতীয় দায়িত্ব দেবার কথা বলেছেন। তিনি মহিলাদের সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা হয়, "আমাদের দেশ যে, আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে তার একটি নিশ্চিত লক্ষ হলো রাষ্ট্রে মেয়েদের বর্তমান অবস্থান। রামমোহন থেকে শুরু করে অদ্যবধি আমরা মেয়েদের সমান অধিকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সংবিধানে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে শুধু নয় বরং এটা তাদের দায়িত্বও বটে। আমরা মূলত নারীসূলভ গুণাবলি প্রত্যাশা করি। "[১০]

৩.৬ শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের মতামত

যাঁরা শিক্ষক শিক্ষিকা হবেন তাঁরা যেন শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে একটা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। একজন শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের একটি গণতান্ত্রিক দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা যেন নতুন নতুন বিষয় জানতে আগ্রহী হয় তার জন্য তাদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিশীল কাজে কৃতিত্ব দেখাতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তিনি বলেন, "একজন শিক্ষকের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁকে অবশ্যই একজন নিবেদিত মানুষ হতে হবে। ভবিষ্যৎ মানবতার ভবিষ্যৎ মানুষের বিশ্বাসের প্রতি নিবেদিত হতে হবে।...তাঁর যদি এরূপ বিশ্বাস না থাকে তবে তিনি বেশিদূর এগোতে পারবেন না। একটা জাতি গঠনে একজন শিক্ষক খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এমনটি শুধু বলি কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তার কোনোটাই অনুসরণ করি না।"[১১]

একজন শিক্ষক নির্ভয়ে তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং এই এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য হবে ছাত্রদের শিক্ষিত করে জাতির কল্যাণে তাদের উদ্বুদ্ধ করা। শিক্ষার্থীদের উচ্চ ভাবাদর্শে ভাবিত করতে এবং উৎসাহিত করতে শিক্ষকই পারেন। রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষাবিদ হিসাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণকে জাগতিক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি ছিলেন, এটাই ছিল তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলেন, দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তোলেন। শিক্ষক পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সঞ্চালিত করে থাকেন যা জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন এবং এইভাবে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষিত করা হয়ে থাকে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক শিক্ষার্থীই মন্তব্য করে থাকেন যে, ভারতে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা নেই কিন্তু পরীক্ষা ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকে ভালোবেসেই হোক আর না ভালোবেসেই হোক যাঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত আছেন তাঁদের প্রায় সকলেরই মতে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথক করতে পারিনি।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি পরীক্ষা নির্ভর। বর্তমান শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় পাশ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর শৈশবকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। রাধাকৃষ্ণণ পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন, "আমরা যেমন সমাজ গঠন করতে চাই শিক্ষা তেমন হওয়া উচিৎ। মানুষের মর্যাদা ও সমতাভিত্তিক একটা আধুনিক গণতন্ত্র গঠনে আমরা কাজ করছি। এগুলো শুধু ধারণাই; আমাদের উচিৎ এগুলো কাজে রূপান্তর করা। আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ হওয়া উচিৎ মহৎ নীতি বাস্তবায়ন করা।"[১২]
শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া যাতে শিক্ষার্থীরা সমাজজীবনে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ, নৈতিক বিকাশ, সৌন্দর্যবোধের বিকাশ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ উন্নত করতে হবে।

সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাবধারা এবং সমাজের চিরাচরিত প্রথা সংরক্ষণ করে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করা হয় শিক্ষার মাধ্যমে। সুতরাং কলেজগুলোর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। কলেজের আবহাওয়া যেন রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার হাওয়ায় দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

আমাদের মত গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে বহু ধর্ম, জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রে বাস করে সেখানে সমাজের প্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে সুষ্ঠু নেতৃত্বের ওপর এবং এই নেতা তৈরি করে একটি সুস্থ শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল করতে হবে, আত্মবিশ্বাস জাগাতে হবে, কর্তব্যে অবিচল থাকতে হবে, নিজেকে দায়িত্ব নিতে সক্ষম হতে হবে এ সবই জাতির উন্নতির জন্য প্রয়োজন। রাধাকৃষ্ণণ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "জাতির উন্নতি নির্ভর করে আমাদের চরিত্রের উপর। ভাগ্যকে চরিত্র বলা হয় এবং এর দ্বারা যা বুঝায় তা হলো ভবিষ্যৎ সুন্দর ফলের আশায় ব্যর্থতাকে হাসিমুখে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা।"[১৩]

শিক্ষা মানুষকে উন্নত করে, সত্যকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে যা জীবনকে সুন্দর করে তোলে, শিক্ষার্থীদের কুসংস্কার মুক্ত করে। শিক্ষার দ্বারা মানুষ জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হয় এবং সমাজের খুঁটিনাটি সমস্তবিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। মানুষের অভ্যন্তরীণ মূল্যবোধের মূল্যায়ন শিক্ষার দ্বারাই সম্ভব।

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিচক্ষণ শিক্ষার্থী তৈরি করে না। এর ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মায় এবং নীতিবোধটা খুব শৃঙ্খলিত হয় না। রাধাকৃষ্ণণের নিজের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় শিক্ষার্থী ভোগে, "Secpticism in faith, anarchy in morals. They do not know which way to turn and what to do."[১৪] যে সকল শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে জাতিকে গঠন করবে, তারা যুক্তিগ্রাহ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। জাতি গঠনের জন্য শক্তিশালী শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন।
রাধাকৃষ্ণণ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৩.৭ জাতির শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ একজন ভারতীয় দার্শনিক বলে পরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সাধনের দেশ। নানা ভাষা, নানা মত ও নানা পরিধানের মানুষ এখানে বাস করেন কিন্তু সকলেই

ভারতীয়। ভারতে বিভিন্ন সময়ে অনেক বিদেশি এসেছে। কেউ এসেছে দেশ জয় করতে, কেউ আসছে ছাত্র হিসেবে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে, কেউ এসেছে বাণিজ্য করতে। যারা এসেছে তাদের সবাইকে ভারত স্বাগত জানিয়েছে। নানা ধর্মমতের মানুষ, নানা ভাষার মানুষ, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এসে রয়ে গেছে। তারা সকলে নিজের ভাষা, নিজের ধর্ম, নিজের আচার-আচরণ যথাযথ রেখেও ভারতীয় হয়ে গেছেন। এভাবে ভারতের মাটিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ভারতের এটি একটি মহৎ অবদান। এটি সম্ভব হয়েছে ভারতবর্ষের সনাতন দার্শনিক জীবনবোধের জন্য। ভারত বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টির সর্বত্রই এক ঈশ্বর বিদ্যমান। বাহিরের রূপে পার্থক্য থাকলেও ভেতরের সবই এক। সমস্তবিশ্ব কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা থেকে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যন্ত পরিচালিত হয় সেই একই ঈশ্বরের ইঙ্গিতে। মানুষ যা কিছু করে তার পশ্চাতেও সেই ঈশ্বরেরই ইচ্ছাশক্তি কাজ করে। এক ঈশ্বর যদি সর্বত্র বিরাজ করে তবে সব বস্তুই তো অন্তরে অন্তরে একক। সুতরাং মানুষে মানুষে ভেদ নেই। বিশ্বের সমস্ত মানুষ একে অপরের ভাই, একই ঈশ্বরের পিতা।

এ থেকেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের জন্ম। বাইরের পার্থক্যের আড়ালে একই দেবী সত্তা সর্বত্র অবস্থিত। ভারতীয় দর্শনের এই মতবাদটি মানুষকে সমস্তবস্তু ও জীবকে একই দৃষ্টিতে দেখবার এবং ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছে। এই দার্শনিক মতবাদটি রাধাকৃষ্ণণ অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। এই মতবাদটিকেই তিনি যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে বিশ্বে প্রচার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ যে ব্যবহারিক বেদান্তের কথা বলেছিলেন তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন... “A nation is built in its educational institutions.... if our institutions give our young men and women character and democratic discipline, the future of our country is safe.”[১৫]

ভারতবর্ষের দার্শনিক মতবাদ পাশ্চাত্যে অবহেলিত ছিল, ভারতবর্ষকে সভ্য দেশ বলে ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষেরা মনে করত না। এর কারণ এই যে, ভারতবর্ষ ধনদৌলতে দরিদ্র ছিল। দরিদ্র হলেই যে ভারতবর্ষ অসভ্য একথা একেবারেই মিথ্যা। রাধাকৃষ্ণণ পাশ্চাত্যে তাঁর বক্তৃতায় প্রমাণ করেছেন যে, ধনদৌলতে দরিদ্র হলেও ভারত একটি সুসভ্য দেশ এবং ভারতের সভ্যতা ও ধর্ম

বিশ্ববাসীকে অখণ্ড মানবিক ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই শিক্ষাই ভারতের শিক্ষা। রাধাকৃষ্ণণ এই শিক্ষাই বিশ্ববাসীর কাছে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। বিরোধ নয় ঐক্য, যুদ্ধ নয় শান্তি ভারতের বাণী। এই শিক্ষা প্রদানের গুরু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। এক্ষেত্রে তিনি আমাদেরই শিক্ষক নন, বিশ্ববাসীর শিক্ষক।

পাশ্চাত্য মনে করত যে, ভারতে যে সমস্ত ধর্ম আছে তার সব কটিই আচার-আড়ম্বরে ভরা। এরা ঠিক ধর্ম নয়। ভারতের ধর্মে আচার অনুষ্ঠানের প্রাণহীন আড়ম্বর আছে এবং ভারত ধর্মের অর্থ জানে না। তাই ভারতবর্ষের মানুষ অসভ্য ও ধর্মহীন এবং অনাচারী। রাধাকৃষ্ণণ সনাতন ভারতের ধর্মের ব্যাখ্যা পাশ্চাত্যে শিক্ষক মহলে প্রচার করলেন। নানাভাবে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাধনাই ধর্ম। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান এবং মানুষের ভেতর আত্মারূপে অবস্থিত। মানুষ চায় কর্মের মধ্য দিয়ে সর্বব্যাপী এবং অন্তরে অবস্থিত আত্মারূপে ঈশ্বরের পূজা করতে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদনের কথাটি বিচিত্র হতে পারে কিন্তু ঈশ্বরে আত্মনিবেদনের ব্যাপারটিতে ভেদ নেই। আগ্রহ, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা ও সততায় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই ধর্ম। মানুষ আত্মশক্তিতে এই পথে সিদ্ধিলাভ করে। সে আত্মবিদ হয়। আচার অনুষ্ঠানে যাই হোক অথবা আচার অনুষ্ঠান থাকুক বা না থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। মূল কথা হচ্ছে সত্যকে ধরে রাখা। সত্যই ঈশ্বর। ভালোবাসা, সততা ও আন্তরিক সহানুভূতি ও সমতা দিয়ে সমস্ত বস্তু ও বিষয়কে অন্তরে অন্তরে আপন করাই ধর্ম। কী আচার উপচার হল তার চেয়ে বড় বস্তুর মধ্যে ভাব-যুক্তি ও বিশ্লেষণ দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান। যিনি ধার্মিক তিনি এই পথের পথিক। রাধাকৃষ্ণণ, রবীন্দ্রনাথ, গৌতম বুদ্ধ, মহাত্মা গান্ধি প্রমুখের জীবন উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতের দর্শন ও ধর্মের পরিপক্ক ফল এদের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এদের কর্ম ও জীবন থেকে ভারতের দর্শন ও ধর্মের উচ্চারণ মিলবে। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী এই বিশ্লেষণ অস্বীকার করতে পারেনি। তারা ভারতীয় ধর্মের উচ্চ আদর্শকে স্বীকার করেছে। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন অন্ধকার ঘরে আলো জ্বেলে দেবার গুরু। এক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণণ একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি বলেন, "যথার্থ শিক্ষা বলতে একজন কর্মদক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তিকে বুঝায় যার পবিত্র চালিকাশক্তি ও সামাজিক উদ্দেশ্য রয়েছে। তিনি হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যিনি সমাজকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা যদি তা অর্জন করতে চাই তবে আমাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যাসমূহ দূর করতে হবে।"[১৬]

রাজনীতির ক্ষেত্রেও রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। তিনি রাজনীতির লোক নন, ভারতের রাষ্ট্রদূত রূপে রাশিয়া যাবার আগে কোনোদিন রাজনীতি করেননি, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনো যোগও ছিল না। ভারত যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, শক্তি-সামর্থ্য-সম্পদ ও রাজনীতিক প্রজ্ঞায় বিশ্বের জাতিসংঘের কোনো জাতির চেয়ে হীন নয় তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁকে রাষ্ট্রপতি হবার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সবিনয়ে তা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন প্রজ্ঞাবান, দার্শনিক, বিচক্ষণ, রাজনীতিবিদ আজ পর্যন্ত কোথাও হয়নি। গান্ধিজি বলেছিলেন-"আমার জীবনই আমার বাণী"। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও বলেছিলেন, "আমার জীবনই আমার রাজনৈতিক আদর্শ।"[১৭] রাজনীতির ক্ষেত্রে যে গুণগুলি রাজনীতিবিদকে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সেই গুণগুলিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁর মতো হওয়ায় শিক্ষাই রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর বাণী। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক শিক্ষকতায় তিনি রাষ্ট্র পরিচালকদের শিক্ষক।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, সুপন্ডিত, সুলেখক, দার্শনিক, বাগ্মী, সফল কূটনীতিক কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ। রাধাকৃষ্ণণের সমসাময়িক বাঙালি দার্শনিক পন্ডিত ও অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সে সময় অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় বিশ্বনন্দিত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; কোন অংশেই বিদ্যাবত্তায় সমকালের সমধর্মীদের চেয়ে কম ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এজন্য দর্শন শাস্ত্রের এই শাখাটির অধ্যাপক পদের নাম তাঁর নামে উৎসর্গ করেছে। ভারতীয় সনাতন ধর্ম, সমাজ ও ভারতীয় দর্শন ও মানবতাবাদ তাঁর অধ্যাপনার প্রধান বিষয় ছিল। অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমকালে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপকরূপে নন্দিত হয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি হিসেবে যোগদানের পর সমগ্র জাতি বিষয়টিকে স্মরণীয় করতে একটি জাতীয় সংবর্ধনার প্রস্তাব করে। তিনি তখন সরকারকে জানান যে, আমি একজন শিক্ষক, শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড। নেশন বা জাতি গড়ে তোলেন শিক্ষক। যে দেশে আদর্শ শিক্ষক থাকেন সেই দেশই কর্মে ও মননে গৌরব অর্জন করে। আমাকে যদি সংবর্ধনা জানাতে হয় তবে আমার জন্মদিনটিকে 'শিক্ষক দিবস' বলে সরকারি মান্যতা প্রদান করা হোক। এটি হবে আমার শ্রেষ্ঠ সংবর্ধনা। ভারত সরকার ও সমগ্র জাতি অভিভূত চিত্তে শিক্ষাগুরু সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের রাষ্ট্রপতি পদে প্রথম বার্ষিকীর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস

হিসেবে পালন করে আসছে। তিনি শিক্ষক দিবস পালনের মধ্য দিয়ে জাতির সমস্ত শিক্ষককে অভিবাদন পাঠিয়েছিলেন। শিক্ষক দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আমাদের শিক্ষকদেরও প্রণাম নিবেদন করি। এই ঘটনাটি প্রমান করে যে অনেক কিছু কাজ করলেও নানা দিকে তাঁর কর্মধারা সম্প্রসারিত হলেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, জাতির শিক্ষক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ।

৩.৮ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণের ধারণা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উচ্চতর এক বিশেষ ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয় একটি এমনই সংস্থা যেখানে মানবিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষণ দেওয়া হয় এবং এই রূপ শিক্ষণই হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লব্ধ বিষয়গুলি প্রকৃতই অনুধাবন করবেন, লব্ধ জ্ঞানের আভ্যন্তরীণ সত্যের সঙ্গে নিজেদেরকে একান্ত করে নিতে পারবেন তখন তারা সেই সত্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি স্বার্থ ভুলে যাবেন এবং নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধানে আত্মহারা হবেন। জ্ঞানচর্চাই শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারাকে পরিমার্জিত করে শোধিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ই তার শিক্ষার্থীদেরকে ইতিহাসের সূত্রে অতীত ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত সম্পদের সন্ধান দিতে পারে এবং এটাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লব্ধ উক্ত মূল্য অমূল্য সম্পদ নিয়ে শিক্ষার্থীরাই দেশ, জাতি ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রকাশিত মানব সম্পদের বিকাশকে সম্ভব করে তুলতে পারেন।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষাগত পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রসঙ্গে শিক্ষকদের গুণগত মানের কথাও বলেছেন। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও বুদ্ধির বিচারে উচ্চমার্গের পন্ডিত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারত যুবক যুবতীরা যাতে সারা জীবন যৌবনসুলভ তেজবীজ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চিরানন্দের অধিকারী হতে পারে তার জন্যে তাদেরকে তৈরি করে দেওয়াই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই তৈরি করবেন দেশ ও জাতির নেতৃবর্গকে। সুতরাং তাঁদের নিজেদেরকেও হতে হবে দেশ ও জাতির আদর্শের প্রতীক।

পাণ্ডিত্যের বিচারে অনেক শিক্ষকই উচ্চমানের হতে পারেন কিন্তু তাঁরা যদি আত্মমুখী ও মাত্রাতিরিক্ত আত্মসচেতন ও আত্মস্বার্থের অধিকারী হয় তাহলে তাঁরা কখনই শিক্ষার্থীদের জন্যে নিজেদের জ্ঞানভান্ডারকে উজাড় করে দিতে পারেন না। এই গুরু বা আচার্যকে হতে হবে এমনই উদার, সহানুভূতিশীল যেন তিনি শিষ্যের জন্যে-শিষ্যকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিজের জ্ঞান ভান্ডারের সঙ্গে নিজের চিন্তা ও কর্মের আদর্শ দিয়ে শিক্ষার্থীকে প্রত্যাশিত মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন। তবে এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হল, শিক্ষকদের জীবন জীবিকার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা, দিতে হবে। যেন তাঁরা শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। যদি শিক্ষকের নিজের জীবন-জীবিকা সংসারের সমস্যাদি নিয়ে জর্জরিত হতে হয় তা হলে তাঁর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষার্থীদের জন্যে মনে প্রাণে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা কখনই সম্ভব হতে পারে না। ড. রাধাকৃষ্ণণ নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থাকাকালীন শিক্ষকদের সুবিধা ও অসুবিধার কথা সহজে অনুধাবন করেছিলেন।

ড. রাধাকৃষ্ণণ প্রকৃত শিক্ষার প্রতীক হিসেবে দেবী সরস্বতীর তাৎপর্যের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলতেন, দেবী সরস্বতীই আমাদেরকে ভাল-মন্দ, বাঞ্চনীয় ও অবাঞ্চনীয়, সত্য-অসত্যের বিচার-বিশ্লেষণে উৎসাহিত করতে পারেন। ভিতর থেকে প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যের অনুসন্ধানে দেবী সরস্বতীই উৎসাহিত করতে পারেন।

অবশেষে ড. রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তার ইচ্ছাপত্র বা উইল হিসেবে স্বাধীন ভারতের "বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট" এর বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও সাধনার অবদান। তিনি বলেন, "শিক্ষা হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। আমাদের যদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মিথস্ক্রিয়ায় কাজ করতে হয়। আমাদের যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উন্নতি বিধান করতে হয়, আমাদের যদি কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়, তবে আমাদেরকে শিক্ষাকে যথার্থ উপায়ে ব্যবহার করতে হবে। "[১৮]

শিক্ষার, বিশেষভাবে উচ্চ শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ও যথাযথ সুপারিশের মাধ্যমে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রত্যাশিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেন। তিনি শুধু শিক্ষা নয়, ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে এক কথায় স্বাধীন ভারতের প্রাণপুরুষ

হিসেবে নন্দিত। তাঁকে আমরা যাতে ভুলে না যাই-তাঁর আদর্শ ও জীবনদর্শন যাতে যুগ যুগ ধরে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয় তাঁর জন্যেই তাঁর জন্মদিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসেবে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই দিনেই সেই সব শিক্ষককে পুরষ্কৃত করা হয় যাঁরা আমাদের শিক্ষা-পিরামিডের ভিতকে সুদৃঢ় করতে আত্মোৎসর্গী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। তাহলে নিঃসন্দেহে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারাই এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মের সমাধান হতে পারে। তাই ভারতের প্রাণপুরুষ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনের অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'শিক্ষক দিবস' স্বার্থক হয়ে উঠুক এটাই সবর্জনকাম্য-যেন সুদৃঢ় শিক্ষা পিরামিডের উর্দ্ধদেশে যে প্রতিভাবনার আরোহণ করবেন তাঁরা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, বিশ্বকে পথনির্দেশ দিতে পারেন।

তথ্যসূচি

১. S. Radhakrishnan, *Education, Politics and War,* The International Book Service, Poona, 1944, p-42.

২. Radhakrishnan Reader, *An Anthology,* Bhartiya Vidya Bhawan, Bombay, 1962, p-497.

৩. S. Radhakrishnan, *The Creative Life,* Orient Paper Backs, New Delhi, 1975, p-24.

৪. Ibid, p-25.

৫. S. Radhakrishnan, *Religion & Society,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1984, p-57-58.

৬. S. Radhakrishnan, *President Radhakrishnan's Speeches and Writings* (May 1962 - May 1964), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, p-258.

৭. Ibid, p-260.

৮. S. Radhakrishnan, *Recovery of Faith,* Vision Books, New Delhi, 1983, p-99.

৯. Dr. Paitoon Patyaiying, *S. Radhakrishnan's Philosophy of Religion*, Kalpaz Publication, Delhi-110052, 2008, p-70.

১০. S. Radhakrishnan, *President Radhakrishnan's Speeches and Writings* (May 1962 – May 1964), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India, p-262.

১১. S. Radhakrishnan, *True Knowledge,* Orient Paper Backs, New Delhi, 1984, p-33-34.

১২. S. Radhakrishnan, *The Creative Life,* Orient Paper Backs, New Delhi 1975, p-24.

১৩. S. Radhakrishnan, *The Philosophy of Rabindranath Tagore,* Macmillan, London, 1918, p-35.

১৪. Ibid, p-65.

১৫. S. Radhakrishnan, *Education, Politics and War,* The International Book Service, Poona, 1944, p-65.

১৬. Ibid, p-82.

১৭. Ibid, p-97.

১৮. S. K. Dhawan, *Sarvapalli Radhakrishnan (1888-1975),* Wave Publications, Delhi, 1991, p-55.

চতুর্থ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন

৪.১ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাঃ প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু

৪.২ ধর্মের সংঘাতঃ হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

৪.৩ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-১

৪.৪ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-২

৪.৫ ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন

৪.১ ধর্মীয় অভিজ্ঞতাঃ প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, প্রত্যেক ধর্মেরই অতীত ঐতিহ্য খুব পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। যে সমাজে তার ঐতিহ্যকে পবিত্রতার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করতে পারে, সে সমাজ ক্ষমতা ও স্থায়িত্বের অশেষ সুযোগ ভোগ করে। বৈদিক ঐতিহ্য পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বলে নানা সংস্কৃতিকে রূপান্তরিত করতে এবং সভ্যতাকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ জীবনকে পবিত্র করে তোলে, এমনকি যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই তাদেরও। এ প্রসঙ্গে Patric এর মতে, "Religion is the Consciousness of our Practical relation to an invisible Spiritual order."[১]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে বিশ্বে এক নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করে। কী সেই মানসিকতা? বিভিন্ন ধর্মীয় ভারের একত্র সমাজের মানসিকতা এক ধর্মের অনুরাগীর জন্য ধর্মের কথা শোনার মানসিকতা। ফলে বিভিন্ন ধর্মের ভিতর বিরাজমান পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রকাশিত হওয়ার এক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মের ধারা বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সকল ধর্মেরই লক্ষ্যবস্তু। এ যেন বিচিত্র ফুলের গ্রথিতমালার মধ্যে সূত্রাকারে বিরাজিত সেই একই বস্তু। এই বস্তুটি বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ঈশ্বর, গড, আল্লাহ প্রভৃতি নামে উল্লেখিত।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক King George V ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ধর্মের উপর বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি সেখানে *"The Hindu View of Life"* প্রসঙ্গে চারটি বক্তৃতা দেন। এ বক্তৃতামালায় হিন্দুধর্ম–দর্শনের সারকথাগুলি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলি হিন্দুধর্মের গুরুত্ব, মাধুর্য ও দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ।

সকল ধর্মদর্শন মানবজীবনের তাৎপর্য বহন করে। পরস্পরের সান্নিধ্যলাভ এবং ভাবগ্রহণের জন্য প্রত্যেকের ধর্মানুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাভাবাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। এরূপ চিন্তা-চেতনা মানব মনের সংস্কার সাধন করে এবং মানুষকে উদার করে। বাহ্যিক ধর্মীয় আচারে পার্থক্য থাকলেও সকল ধর্মে আন্তরিক ধর্মভাব এক ও অভিন্ন। বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে এ উদার ধর্মভাবের কথা শাস্ত্র উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

হে প্রভু, বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে যেরূপ নদীসমুহে সমুদ্রে পতিত হয়, ভিন্ন রুচি হেতু সরল ও কুটিল প্রকৃতির নানা পথগামীদেরও তুমিই সেরূপ একমাত্র গম্যস্থান। এটি প্রাচীনতম সনাতন ধর্মের সারতত্ত্ব। এ সত্যের সার্থক বহিঃপ্রকাশ ঘটে স্বামীজীর ভাষণে-কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীর মত আমরা সহ্য করি তা নয়, সকল ধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করি।

স্বামীজীর প্রতি ড. রাধাকৃষ্ণণের সশ্রদ্ধ উক্তি-তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক মহিমার প্রতি নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেন এবং মানুষের অফুরন্ত অধ্যাত্মসম্পদের কথা স্মরণ করিয়ে দেন-এ আধ্যাত্মিক অনুভূতিই মানুষের একত্বানুভূতি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "While the Salvation of the soul is the end of religion, the discovery of truth is the object of Philosophy."[২]

প্রথমত, হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা নিরূপণ করতেই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেকে মনে করেন হিন্দু এমন একটি শব্দ যার সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর কোন মিল নেই। হিন্দুধর্ম কি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের মিলন? বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মিশ্রণ? একটি মানচিত্র? একটি ভৌগলিক বিশ্লেষণ? এর বিষয়বস্তু যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বৈদিক যুগে এটি যা ছিল উপনিষদের যুগে তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করেছে এবং বৌদ্ধ যুগে আরও রূপ পাল্টিয়েছে। শৈবদের কাছে এটি একরূপ, বৈষ্ণবদের কাছে অন্যরূপ এবং শাক্তদের কাছে এর আরও ভিন্ন এক রূপ। যাঁরা হিন্দুধর্মের সাহচর্যে এসেছেন তাঁদেরহ রীতি নীতি ও ধর্মে গৃহীত হয়েছে। খুবই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধীনে একীভূত করা এক কঠিন সমস্যা। কিন্তু এর বৈচিত্যময় ভাবকে ও গতিময় কালকে যদি একসূত্রে গ্রথিত করা না যায় তাহলে হিন্দুধর্মের অবদানও মূল্যায়ন করা যাবে না।

প্রকৃতির অন্ধ নিয়মগুলো বাদে জগতে এমন কোন নিয়মই নেই যা মূলত গ্রিক নয়-এই অনুশাসন বাক্যটি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিকট সর্বোতগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপর দণ্ডায়মান। চীন, জাপান, তিব্বত, শ্যাম (থাইল্যান্ড), ব্রহ্মদেশ ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা) প্রাচীন ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের গুরুগৃহ (ধর্মের ঘর) হিসেবে, এই সত্যটি অল্পদিনের নয়। এর ঐতিহাসিক নজির চার হাজার বছরের পুরাতন। এই চারহাজার বছরের গুরুতেও হিন্দুধর্ম সভ্যতার একটা উচ্চস্তরে দণ্ডায়মান ছিল। যা অধিধ্বস্ত থেকে

আজকের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে যদিও তার গতি ছিল কখনও ধীর কখনও স্থির। চার পাঁচ হাজার বছরের আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনার চাপ ও ধবল একে সহ্য করতে হয়েছে। তথাকথিত হিন্দু সভ্যতার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাগণ বা অনুসারীগণ কর্তৃক সিন্ধু নদীর অববাহিকার পাশ্ববর্তী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব অঙ্গলে বসতি স্থাপন করার পরেই 'হিন্দুসভ্যতা' এ নাম ধারণ করে।

ভারতের দিকে সিন্ধু নদীর তীরে যে জনগোষ্ঠী বসবাস করতেন তাঁদেরকে পারস্যের লোকেরা এবং পশ্চিমের দিক থেকে আগত আক্রমণকারীগণ হিন্দু বলত। পাঞ্জাব থেকে হিন্দু সভ্যতা ক্রমাগত গঙ্গানদীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে নানান প্রাগৈতিহাসিক নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে। আরও এগিয়ে দাক্ষিণাত্যের কাছে আর্য সভ্যতা (হিন্দু সভ্যতা) দ্রাবিড়ের সংস্পর্শে আসে এবং তাঁদেরকে অনুগত করে নেয়, যদিও দ্রাবিড়দের প্রভাবে তাঁদের নিজেদের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে হিন্দু সভ্যতার মধ্যে আরও অনেক পরিবর্তনই আসে কিন্তু সিন্ধুতীরবর্তী তার মূল বৈদিক ধারা সর্বত্রই অক্ষুন্ন থাকে। হিন্দু শব্দটির মূল তাৎপর্য স্থানগত, বংশগত নয়। এ দ্বারা চিহ্নিত ভৌগোলিক সীমায় বাস বোঝাত। প্রাগৈতিহাসিতক যুগের মানুষ, বন্য মানুষ, অর্ধসভ্য মানুষ, সুসভ্য দ্রাবিড় এবং বৈদিক আর্য সকলই হিন্দু কারণ সকলই এক জননীর সন্তান। হিন্দু দার্শনিকগণ বাস্তবতার সঙ্গে অনুভব করেছেন যে, ভারতে বসবাসকারী নর-নারীগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তগর্ত, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় আচারের অনুসারী।

ধর্মের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি চমৎকার এবং আনন্দদায়ক। সাধারণত নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তা চেতনা এক ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র করে রাখে। কিন্তু হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনায় এমনতর সীমাবদ্ধতা নেই। জ্ঞান স্বত:স্ফূর্ত অনুভূতির অধীন, মতবাদ অভিজ্ঞতার অধীন এবং বাহ্যিক প্রকাশ আন্তরিক অনুভবের অধীন। কতকগুলো উদ্ধৃতির প্রতি স্বীকৃতিদানই ধর্ম নয়, কতকগুলো উৎসব পালনই ধর্ম নয় ধর্ম এক ধরনের জীবনযাপন বা অভিজ্ঞতা।

ধর্ম সত্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি বা অন্যভাবে বলতে গেলে ধর্ম হলো সত্যকে উপলব্ধি করা। এই উপলব্ধি আবেগের চমক নয় বা বিষয়ের চাকচিক্য নয়। এই উপলব্ধি সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিবেক-সত্যের ঘনীভূত

মূর্তি। ধর্ম অন্তরের এবং অন্তবাত্মার দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কিছুই নয়। যদিও ধর্ম জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ এবং নৈতিকতাবোধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে।

ধর্মীয় উপলব্ধি আত্ম প্রত্যয়িত চরিত্র; এটি স্বতঃসিদ্ধ এবং নিজেই তার পরিচয় বহন করে। কিন্তু ধর্মযাজক তাঁর অন্তর্দৃষ্টির বিশ্বাসসমূহ যুগধর্মের নিরিখে তুলে ধরতে বাধ্য হন। যদি জ্ঞান বুদ্ধির এই স্থৈর্য না থাকে যাজককে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হবে। এই অর্থে ধর্ম বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান। ধর্মপালনের শ্রম ব্যতীত ধর্মের আশীর্বাদ ভোগের জন্য যান্ত্রিক বিশ্বাস, উপলব্ধি প্রসূত ধর্ম বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রত্যেক ধর্মেরই অতীত ঐতিহ্য খুব পবিত্র হওয়া প্রয়োজন। সমাজে তার ঐতিহ্যকে পবিত্রতার উজ্জ্বল আলোকে খন্ডিত করতে পারে সে সমাজে ক্ষমতা এ স্থায়িত্বে অশেষ সুযোগ ভোগ করে। বৈদিক ঐতিহ্য পবিত্রতায় পরিপূর্ণ বলে নানা সংস্কৃতিকে রূপান্তরিত করতে এবং সভ্যতাকে স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিল। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ জীবনকে পবিত্র করে তোলে, এমনকি যাদের অন্তর্দৃষ্টি নেই তাদেরও ঘাত প্রতিঘাত, সমস্যা-জটিলতা ও পাপ পুণ্যের মাঝে মানুষের পরিমিত যুক্তি প্রয়োগের বা নিয়মিত ধ্যান উপাসনা করার ধৈর্য্য থাকে না। তারা কিছু সূত্র বা কিছু নিয়ম নীতি গ্রহণ করে দিতে চায় যার মাধ্যমে তারা একটা জীবনাদর্শের দিকে অগ্রসর হয়। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে,

> "Hinduism is not a definite dogmatic creed, but a vast, complex, but subtly unified mass of spiritual thought and realization. Its tradition of the godward endeavour of the human spirit has been continuously enlarging through the ages."[৩]

বেদের প্রতি হিন্দুদের মনোভাব সতর্ক বিশ্বাসের অভিসারী। কারণ আস্থা ও প্রকৃতি যা আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহায্য করেছে তা আমাদেরও কাজে লাগাতে পারে। সতর্কতার কারণ অতীতের সাক্ষী যতই মূল্যবান হোক না তা কোন মতেই বর্তমানের অধিকারকে খর্ব করতে পারে না। প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিধ্বনির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান ও প্রেম প্রকাশ কখনও নিঃশেষ করে ফেলেন

না। এতদূব্যতীত আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। জ্ঞান বাড়লেই ধর্মতত্ত্ব উন্নত হয়। যুক্তিতর্কের ধোপে ঐতিহ্য বা প্রথার যে অংশটাকে কেবলমাত্র তাই গ্রহণযোগ্য, সম্পূর্ণ প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়।

হিন্দুধর্মের দর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে শুরু, পরীক্ষা নিরীক্ষাতেই এই দর্শন জীবন্ত। এই ভিত্তি মানব প্রকৃতির মতই ব্যাপক। অন্যান্য ধর্মীয় পদ্ধতিসমূহ কোন স্বীকৃত সত্য থেকে শুরু। হিন্দু দার্শনিকের অন্য ধর্মের যথার্থ সত্যকে স্বত:স্ফূর্তভাবে স্বীকৃতি দেন এবং স্মরণীয় মনে করেন। পৃথিবীর সকল দেশের, সকল বর্ণের, সকল সভ্যতার, সমস্ত মানবজাতি, যদি ঈশ্বরের সন্তান হয়, এখন এটা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর বিরাট সৃজন ও পালন বেষ্টনীর মাঝে সকলেই তাঁর জ্ঞানে আলোকিত করে তাঁর প্রেমে আপ্লুত হচ্ছে নিজের সীমিত গন্ডির ভেতর থেকে তার পরম সত্যের জ্ঞানে পৌছতে। হিন্দু যখন দেখল যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পথে ঈশ্বর লাভ করছে তখন সে সাধারণভাবে সবগুলো পথকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ইতিহাসে তাদের যথার্থ স্থানের মর্যাদা দিয়েছে। হিন্দু বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থসমূহ ব্যবহার করে আত্ম উৎকর্ষের জন্য। কারণ রুচিবোধ ও বুদ্ধিসত্ত্বায় উন্নতি, চিন্তা চেতনার উৎকর্ষ এবং আবেগ-উদ্দীপনার নাড়া দেয়ার জন্য বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থগুলো শক্তি যোগায়। হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র বেদের ধর্ম নয়, মহাকাব্য।

বিভিন্ন ধর্মপথের ও ভারতবর্ষে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তকের তাৎপর্য গ্রহণ করে হিন্দুধর্ম অশেষ বৈচিত্র্যময় রঙে রঞ্জিত চিত্র বিচিত্র একটি আভরণ। সময়ানুক্রমিক উত্তেজক এবং অলৌকিক কাহিনীসমূহ নিয়ে যে পুরান তা অনেকাংশে কাল্পনিক সাহিত্য কিন্তু তবুও পবিত্র ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে গণ্য। তার একমাত্র কারণ যে কিছু লোক পুরানের প্রতি আকৃষ্ট। বিশেষভাবে যোগসাধনায় অনুগত যে তন্ত্র তাও ঋকবেদের যুগ থেকে কোন কোন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। তন্ত্র ও পবিত্র সাহিত্যের অংশ হিসেবে গণ্য হয়। অনেক হিন্দু অনুষ্ঠানে তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতির নিদর্শন পাওয়া যায়। যে প্রথাই হোক না কেন যদি তা মানুষকে ঈশ্বরমুখী করতে সহায়তা করে তবে তাই শ্রদ্ধার যোগ্য। সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণবপ্রভাব প্রভৃতি প্রতিটি মতবাদই এক এক ভাবে উদ্দীপিত। কারো কাছে এটি ভালো, কারো কাছে ওটি হলো-কারণ রুচির বৈচিত্র্য। কিন্তু সকলেই পরম সত্যে উপনীত হতে পারে। যেমন বিভিন্ন নদীর গতি বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু সকলেই সাগরে পৌঁছতে পারে।

হিন্দুত্ব তাহলে একটা নির্দিষ্ট মতবাদ নয়। অনেকগুলো আধ্যাত্মিক মতবাদ ও সাধনপথের সমন্বয়। এর ঈশ্বরমুখী সাধনায় মানবীয় কর্মযজ্ঞ যুগে যুগে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলছে। রাধাকৃষ্ণণ এ প্রসঙ্গে বলেন,

"যদিও ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে ভারতে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের আগমন ঘটেছে, হিন্দুধর্ম এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। এমনকি রাজনৈতিক শক্তি দ্বারা ধর্মান্তরিত করেও অধিকাংশ ভারতীয়দেরকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সরাতে পারেনি।"[৪]

যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধ ধর্মীয় প্রসার হিন্দুধর্মে পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে করে নিত্যতা প্রগাঢ় হয়েছে। আমাদের জীবন থেকে চিন্তায় অগ্রসর হই। আবার চিন্তা থেকে উন্নীত হতে পারি সত্যের সুউচ্চ স্তরে। ঐতিহ্যের চির নতুন এবং অনুসারীদের দ্বারা পুনর্নির্মিত হয়। যা চিরায়ত তার চির নির্মাণের জন্য। যদি কোন ঐতিহ্যের উন্নয়নের পথে চলার আর সুযোগ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে এর অনুসারীদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটেছে। হিন্দুধর্মের সমগ্র ইতিহাসে এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির উপযুক্ত আদর্শ ও পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সদা তৎপর রয়েছেন।

হিন্দুধর্মের উন্মেষের তত্ত্বগুলো বেদান্তে নিহিত। বেদান্তের তিনটি ধারা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদগীতা। এইগুলো বিশ্বাস, জ্ঞান ও নিয়মের তিনটি স্তরকে মোটামুটিভাবে ব্যক্ত করে। উপনিষদসমূহ ঋষিদের অভিজ্ঞতা, যাতে রয়েছে যুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খলা। যদিও যুক্তি নিয়ম উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্যের তাৎপর্য যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করাই ব্রহ্মসূত্রের লক্ষ্য। গীতা আমাদেরকে প্রকৃত ধর্মীয় জীবনলাভের উপায় নির্দেশ করে। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা হিন্দু জীবনের পূর্নমান প্রদর্শন করে। রাধাকৃষ্ণণের মতে, "হিন্দুধর্মের অন্তর্গত প্রতিটি মতবাদ বেদান্ত শাস্ত্রকে তার নিজস্ব ধর্মীয় মতবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করে।"[৫] বেদান্ত ধর্ম নয়। এর গভীর বিশ্বজনীন তাৎপর্য নিহিত। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সাধারণ মানদন্ডে একাত্মা। মহাভারতে আছে- বেদ এক, বেদের তাৎপর্য এক। যদিও এই একত্ববোধের অভাবে বহু বেদ সৃষ্টি হয়েছে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে হিন্দু দার্শনিকরা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের নানাবিধ প্রতিমা বা ছবির সঙ্গে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে ধর্মতত্ত্বের অধ্যয়নে আমরা জানতে পারি যে মরমীবাদের নানা ধরণ আছে। হিন্দু চিন্তাবিদগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ে বৈষয়িক অস্তিত্ব আরোপ বিশ্বাস করেন না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ভগবান পরমাত্মা জীবের হৃদয়ে বিরাজমান-জীবের অন্তর, অনুভূতি ইচ্ছা দ্বারা চালিত যারা একথা বলেন তাঁরা অমর।

হিন্দুরা কখনও একেশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করেনি যতই দুর্বল বা ত্রুটিপূর্ণ সেই সত্যের বর্ণনা হোক না কেন, ঋষিগণ দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কথাই লোকচক্ষুর অন্তরাল। ঈশ্বর নিজেকে গোপন করে রাখেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বনে আমাদের মনোভাব বলিষ্ঠ অজ্ঞেয়বাদ। গ্রিক রোমান জগতে অজ্ঞাত দেবতাদের উদ্দেশ্য বেদি তৈরি করার রীতি পরমেশ্বর সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার প্রকাশ। এতে তাঁকে জানার জন্য মানুষের অক্ষমতা রূপক হয়ে আছে।

মানবাত্মা বড় জটিল-এমন জটিল তার পরিবেশ। অনন্ত পরিবেশে অনন্ত আত্মার প্রতিক্রিয়া এই বা সেই সূত্রের ভেতরে সীমিত করা যায় না। আমরা যখন সসীমের চাপে কষ্ট পাই তখন আমরা অসীমের কাছে আশ্রয় নেই। সসীম আমাদের অনেক স্থানে আঘাত দেয় আর এই বহুরূপী আঘাতের ফলই ঈশ্বরের নানান বর্ণনা। মানুষ যেরূপ ঈশ্বর তাদের কাছে সেই রূপ মনে হবেন বলেছেন কেমব্রিজ প্লেটোনিস্ট জন স্মিথ। জগতের অনিত্যতা এবং এর পরিবর্তনশীলতা দেখে উপনিষদের ভবিষ্যত দ্রষ্টা ঋষিরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভাবিত হয়ে সত্যের অন্বেষণে ছুটছেন। 'সৎ' যা মায়ার ধুমের মত উড়ে যায় না। জগতের দুঃখ কষ্টে বুদ্ধের হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছিল। এতে জগতের অনিত্যতা সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো। বুদ্ধ এই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির পথ বের করলেন মানুষের শাশ্বত ধর্ম "ন্যায়পরায়ণতা"।

যে রীতিনীতি আমাদের পরিচালিত করে এর চেয়ে ঈশ্বর বড়। যে বিচার আমাদের নির্দোষ করে এর চেয়ে ঈশ্বর বড়। যে বিচার আমাদেরকে রুদ্ধ করে এর চেয়ে ঈশ্বর বড়। যে পিতার কাছে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য ঋণী তাঁর চেয়ে ঈশ্বর বড় এবং যে মায়ের কাছে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য ঋণী তাঁর চেয়ে ঈশ্বর বড় এবং যে মায়ের কাছে আমরা আবদ্ধ তাঁর চেয়ে ঈশ্বর বড়। ঈশ্বরের

নানা বর্ণনা স্বীকার করা বহুদেববাদে নিমজ্জিত নয়। যাজ্ঞবল্ক্যকে যখন দেবতাদের সংখ্যা বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছিল, তিনি জনপ্রিয় হাজার তিনশত ছয় থেকে শুরু করে কমাতে কমাতে এক ব্রহ্মে পৌঁছেছিলেন। এই অবিনশ্বর স্থায়ী সত্যকে এক করে দেখতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অস্তিত্বের মূল সমস্যা সকল প্রচেষ্টাই একজন সর্বশক্তিমান বা ঈশ্বরকে গ্রহণ করে নেয়। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তি শাস্ত্র এবং মরমীবাদ 'সর্বশক্তিমানের' ধারণাটি পছন্দ করে আর নৈতিক আস্তিক্যবাদ 'ঈশ্বর' এর পক্ষপাতী। আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের চেয়ে এই বিশ্বের চুড়ান্ত কার্যকারণ ও পরিণতি কম নয়। এটি কর্মের মধ্যে কর্ম নয় অথবা অন্য সকল কর্তার কর্তা নয়। বরং এটি সকল কর্তা ও কর্মের চিরকালের বিশ্বব্যাপি কারণ এবং ক্রিয়াশীল নীতি। সত্যের অভিব্যক্তিক ও ব্যক্তিক বিকাশই হচ্ছে তাঁর সম্পূর্ণ ও আপেক্ষিক পন্থা। যখন আমরা সত্যের প্রকৃতিতে যথার্থই জোর দেই, আমরা পাই পূর্ণ ব্রহ্মকে। যখন আমরা আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে জোর দেই আমরা পাই ব্যক্তিক ভগবানকে।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, "হিন্দু দর্শন আমাদের ভগবত জ্ঞানের বিবর্তনে বিশ্বাসী। ভগবত বিষয়ে আমাদের মত ক্রমাগত পাল্টাতে হয় যতক্ষণ না আমরা সকল মতের উর্ধ্বে উঠতে পারি। মতের এই শূন্যাবস্থান সত্যকে কেন্দ্র করে যা আমাদের ধারণা শক্তি অনুভব করার চেষ্টা করে মাত্র।"[৬] হিন্দুধর্ম ভগবান সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণাকে সত্য বা মিথ্যা বলে পার্থক্য করে না। কোন একটা বিশেষ ধারণাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রামাণ্য বা উপযুক্ত মনে করে না। হিন্দুধর্ম এই সুস্পষ্ট সত্যকে গ্রহণ করে যে মানুষ নানাস্তরে এবং নানাপথে ঈশ্বরে পৌঁছতে চায়-তার ঈশ্বর অন্বেষার প্রতিটি পথেই সে ঈশ্বরের সহানুভূতি অনুভব করে।

ঈশ্বর কোথাও প্রতাপ, কোথাও প্রজ্ঞা, কোথাও চেতনা হয়ে প্রকাশিত। যেমন একই শক্তি কখনও সবুজ পাতা, কখনও লাল ফুল ইত্যাদি। আমরা একথা বলি না যে, লাল ফুলগুলো সব সত্য আর সবুজ ফুলগুলো সব মিথ্যা। হিন্দুধর্ম সবগুলো ধর্মমতকে সত্য বলে গ্রহণ করে এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত ভাবকে তাৎপর্য অনুযায়ী সমন্বিত করে। হিন্দুমতে সাধারণ মানুষের হতবুদ্ধি বহুবাদ এবং জ্ঞানীদের আপসহীন একেশ্বরবাদ একই সত্যের বিভিন্ন স্তরের বিকাশ। হিন্দুধর্ম দর্শনের উচ্চভূমিতে ভ্রমণ ও ভগবত জ্ঞানের উন্নতি সাধনে গুরুত্ব দেয়। ব্রহ্ম উপাসনা উপাসনার সর্বোচ্চ স্তর, ব্যক্তি ঈশ্বর

আরাধনার দ্বিতীয় স্তর, অবতার (রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ) প্রমুখ পুরুষের আরাধনা তৃতীয় স্তর। চতুর্থ স্তরে প্রতিমাপূজা সাধুমন্ত্র ও পূর্বপুরুষদের আরাধনা এবং সর্বনিম্নস্তরে ভূত প্রেত সাধনা। জলে থাকেন সাধারণ মানুষের দেবতা, স্বর্গে থাকেন উন্নত মানুষের দেবতা। শিশুর দেবতা কাষ্ঠে, লোষ্ট্রে, এবং অন্তরাত্মায় সাধু সন্তের। কর্মীর ঈশ্বরে আগুনে, অনুভূতিবান হৃদয়ে, দুর্বলের ঈশ্বর মূর্তিতে আর তেজস্বীদের সর্বস্থানে। ঋষিপুরুষ ঈশ্বর দেখেন নিজের আত্মায়, প্রতিমায় নয়।

সাধারণ হিন্দুদের ধর্মীয় মানসিকতার স্তর উন্নয়নের জন্য তথা সমগ্র হিন্দুজগতকে ধর্মক্ষেত্রে একটি উচ্চতর ভূমিতে নিয়ে আসার জন্য ইদানীংকালে এমন কোন গুরুতর আন্তরিক ও ধারাবাহিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। হিন্দু নেতাদের উচিত সর্বোত্তম ঈশ্বরীয় ধারণাটি তুলে ধরা এবং অবিরাম কাজ করে যাওয়া যাতে মানুষ সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে। মঠ মন্দিরগুলোকে শুধু পূজা-উপাসনার স্থান হিসেবে ব্যবহার না করে ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের এবং চিন্তা-চেতনা বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপর্যুক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, রাধাকৃষ্ণণের ধর্ম সম্পর্কে মূল বক্তব্য হচ্ছে–

১. ধর্মতাত্ত্বিক এবং অধিবিদ্যক উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়।
২. জগতের উদ্দেশ্য, পরমসত্তা এবং নৈতিক শাসনকর্তা হিসেবে ঈশ্বর আছেন।
৩. ধর্মের মাধ্যমে জগতের অধিবিদ্যক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা অন্যান্য গতানুগতিক অভিজ্ঞতার মতো নয়। এটা হলো আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধি।

৪.২ ধর্মের সংঘাতঃ হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি

হিন্দু মতবাদকে পৃথিবীর প্রথম মিশনারি ধর্ম মতবাদ হিসাবে গণ্য করা যায়। কেবলমাত্র ধর্মান্তরকারী ধর্মমতগুলো থেকে হিন্দু মিশনারি ভাবধারা ভিন্ন প্রকৃতির। মানব জাতিকে কোন এক মতে ধর্মান্তরিত করা হিন্দুধর্ম মিশন মনে করে না। কারণ ধর্মমত নয়, ধর্ম আচরণই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দেব দেবীর উপাসক এবং বিভিন্ন আচারের অনুসারীদের হিন্দুমতের আবেষ্টনী গঠিত। শ্রীমদ্ভভগবদ গীতার মতে, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র নিগৃহীত ক্ষুদ্র এবং নারীকেই গ্রহণ করেননি; কীরাতহুন প্রভৃতি জাতিকেও গ্রহণ করেছেন। 'তান্দ্য ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন ব্রত্যোস্তম ব্যবস্থায় দেখা ব্যক্তি নয় সম্পূর্ণ গোত্রকেই হিন্দুত্বে আত্মীকরণ করা হয়েছে। আর্যরা তাদের বিজয়ের দিনে ভয়াবহ (যদিও পরাস্ত) প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে একাত্মতা স্থাপন করেছিলেন।

আর্যরা তাঁদের পরাস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের আপাত অমার্জিত সংস্কৃতির প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি। ভারতের আদিম অধিবাসীগণ প্রকৃতির নগ্ন শক্তিসমূহকে পৌরণিক সৌন্দর্যে চমৎকারভাবে আবৃত করে নতুন করেছে। তারা দেব-দেবী, ভূত-প্রেত ও অশরীরী আত্মার একত্র সমাবিষ্ট বহু দৃশ্য বিশিষ্ট বেগবান লম্বা চিত্র রচনা করত। বৈদিক আর্যগণ এ সমস্ত রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের প্রশংসিত ও শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বিধানসমূহের পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। ঋকবেদের দেবতা এবং অথববেদের প্রেতাত্মা সাবলীল দার্শনিক ভিত্তিতে একত্র সম্বিলিত হয়ে এক পরম সত্যের রূপে আমাদের চিন্তা-চেতনার গুণ ও শক্তি অনুযায়ী নানা নামে খ্যাত হয়েছে।

যখন কোনো সম্প্রদায় হিন্দু পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে তখনই এর মহান দার্শনিক আদর্শের প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়। হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কার পদ্ধতি অবশ্যই গণতান্ত্রিক। হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথা মানুষের মন ও নৈতিকতার শৃঙ্খলা দ্বারা প্রতিটি শ্রেণি ও সম্প্রদায়কে সত্যে উপনীত করে। প্রত্যেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহাসিক ভাবগুলো জীবন্ত শক্তি, যদিও আমাদের কাছে এগুলো ছেলেখেলার বেশি কিছু নয়। সংস্কার ভাঙা আর মানসিকতা ও জীবনধারা ভেঙ্গে শান্তি নষ্ট করার সামিল।

ধর্মীয় আচার ও সামাজিক প্রথা শত শত বছরের অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। পৃথিবীতে প্রচলিত বহুবিধ ধর্মের দিকে তাকিয়ে হিন্দু দেখল, অনুসারীদের সামাজিক অবস্থার দ্বারা ধর্মমতগুলো গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাদের ইতিহাস তাদেরকে এমন করেছে। হঠাৎ করে কাউকে পরিবর্তন করা যায় না। এছাড়া ঈশ্বরের মহান উদ্দেশ্য ও বিধান সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে। প্রত্যেক সমাজেরই আছে অধিকার যা অন্যদের সম্মান করা উচিত। ঈশ্বর নেই এমন কিছুরই অস্তিত্ব এই ব্রহ্মান্ডে নেই। রবার্ট বার্নাস যথার্থই বলেছেন, এমন কি যে আলো বিপথগামী তাও ঈশ্বরেরই। অন্যদের দেবতাকে অবজ্ঞা করা সেই লোকদেরই অবজ্ঞা করা, তারা এবং তাদের দেবতা পরস্পর সম্পৃক্ত। হিন্দু জাতি এমনকি বন্য অসভ্যদের দেবতাকেও গ্রহণ করেছে এবং তার নিজ দেবতার সমাসনে স্থান দিয়েছে।

কোন সমাজ বা দলের অপরিণত বিশ্বাসকে সংশোধিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে তার মনের পক্ষপাতিত্ব পরিবর্তন করা। কারণ কোন ব্যক্তি ঈশ্বর সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা নির্ভর করে সে কি ধরনের

মানুষ এর উপর। মানুষের ধর্মীয় মতের বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার মেজাজ শিক্ষা ও পরিবেশ দ্বারা। কারো প্রকৃতির বা অভিজ্ঞতার একদেশদর্শিতার ত্রুটি প্রতিফলিত হয় তার ধর্মীয় সত্যতা গ্রহণের ভঙ্গিতে। ব্যক্তির ভগবানকে বোঝার ক্ষমতা দ্বারা তার ভগবৎ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। সংস্কারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাবকে ত্রুটিমুক্ত করা, তার ভাবকে বিদ্রুপ করা নয়। যখন আধ্যাত্মিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়ে বিশ্বাস আপনা আপনি পরিবর্তন পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভাবের সত্যিকারের পরিবর্তন ভেতর থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ঐতিহ্যের পরিবর্তন ছাড়া মতামত গড়ে উঠতে পারে না। ধর্মগুরুর কাজ উচ্চাকাঙ্খা জাগিয়ে দেয়া, একটা মত চাপিয়ে দেওয়া নয়। যদি আমরা চোখ খুলতে পারি সত্য দেখা যাবে। বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন হিন্দু পদ্ধতি নয়। বরং বুঝিয়ে গুনিয়ে পদ্ধতিকে অধিগত করানোই এর বৈশিষ্ট্য। ভুল অপরিপক্কতার লক্ষণ। এটা মারাত্মক পাপ নয়। সময় এবং ধৈর্যে ভুল সংশোধিত হয়ে যায়। যাই হোক, হিন্দুধর্মের আধ্যাত্মিক চেতনা যতই মজবুত হোক না কেন এটা দুর্বলের ত্রুটিগুলোকে আধ্যাত্মিক চেতনা যতই মজবুত হোক না কেন এটা দুর্বলের ত্রুটিগুলোকেও খানিকটা প্রশয় দেয়।

হিন্দুর কাছে নামের ভিন্নতা তাৎপর্যহীন। কারণ প্রত্যেকটি নাম একই নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নির্দেশ করে। মানুষের কাছে বিভিন্ন নাম একই বিষয়বস্তু নির্দেশ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কালী, বুদ্ধ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নামগুলো নির্বিচারে পরমেশ্বরকে বুঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। ত্রিজগতের কর্তা হরিকে শৈবগণ শিবরূপে বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মরূপে, বৌদ্ধগণ বুদ্ধরূপে, নৈয়ায়িকগণ প্রধান শক্তিরূপে, জৈনগণ মুক্তিরূপে এবং আচারবাদীগণ শাস্ত্র বিধানরূপে আরাধনা করেন। তিনি আমাদের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করুন। বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করের মতে জ্ঞানের বৈচিত্র্যের জন্য একই সত্তাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি বলা হয়। একটি দক্ষিণ ভারতীয় লোক সঙ্গীতে আছে-

"নানা দেশের নানা নদী কত নাম যে ধরে,
পথ চলিয়া তারা সবে এক সাগের পড়ে।
নানা দেশের নানা জাতির কতই নামে জানি,
এক প্রভুরে সবাই মোরা নানা ভাবে মানি।"[৭]

হিন্দুদের সংস্কার পদ্ধতি প্রতিটি সম্প্রদায়কে তার অতীত সংস্কার রক্ষা করতে এবং স্বার্থ ও স্বকীয়তা সংরক্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ ছাত্র যেমন নিজ নিজ কলেজ সম্পর্কে গর্বিত হয়। ছাত্রদের এক

কলেজ থেকে অন্য কলেজে স্থানান্তরের দরকার নেই। প্রত্যেকটি কলেজের মান উন্নয়ন এবং আদর্শ শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে আমরা একই উদ্দেশ্য অর্জনে সমর্থ হতে পারি। জগতে ভাল খ্রিস্টান ও মন্দ খ্রিস্টান যেমন আছে তেমনি আছে ভাল হিন্দু আর মন্দ হিন্দু। তাত্ত্বিক ও বাস্তব উভয় দিক থেকে হিন্দুদের সংস্কার পদ্ধতির সমালোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক ক্যামেন্ট লিখেছেন, "যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের অবতরণ, প্রত্যেক স্থানীয় দেবতা, সম্প্রদায় প্রবর্তক যোগী ও তাপসকে ঈশ্বরের বিকাশ হিসেবে স্বীকৃতি দান, সকল প্রতীক ও প্রার্থনার প্রতি ধৈর্যশীলতাই হিন্দুধর্মের মরমীবাদের উন্নত গতির প্রমাণ। এইটি মরমীবাদ বিরোধীর কাছে যতই বিরক্তিকর বা কুৎসিত হোক না কেন এ দ্বারা হিন্দুধর্ম অন্য যে কোন ধর্মের চেয়ে অধিকতর সহজে, তার অতীতকে বিচ্ছিন্ন না করে বিশ্বজনীন ধর্মের রূপ দিতে পারে। যা প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বা ব্যক্তির পরম সত্যের জন্য বিশ্বজনীন আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ।"[৮]

ধর্ম মানে শুধু বিশ্বাস নয়। ধর্ম মানে ন্যায়পরায়ণ জীবন। ফলে ধর্মকে চেনা যাবে শুধু বিশ্বাসে নয়। সত্যিকারের ধার্মিক অন্যের বিশ্বাস নিয়ে মাথা ঘামায় না। যীশুর মহান বাক্যটি হলো আমার আরও যে সব মেষ আছে তারা এই পালের ন্যায়। যীশু ইহুদী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন এবং ইহুদি থেকেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যে ইহুদিদের মধ্যে ছিলেন তাদেরকে কখনও তিনি এমন কথা বলেন নাই ইহুদি হওয়া খারাপ। খ্রিস্টান হও। ইহুদি ধর্মের যা কিছু অপবিত্রতা আছে তা থেকে যীশু মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। যদি তিনি হিন্দুর ঘরে জন্ম নিতেন তবে হিন্দুদের ধর্ম বিষয়েও তাই করতেন। সত্যিকারের সংস্কারক সংশোধন করে মানবজাতির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেন, সংকোচিত করেন না। রাধাকৃষ্ণণ বলেন,

"ঈশ্বরের অনুভূতি দর্শকের চেতনায় পরিব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু এটি দিনের আলোর মত আসেনা। এটি বাহ্যিক কিছু, এটি দেশের উর্ধ্বে কিছু। এমন অনুভূতিতে দর্শক ও ঐশ্বরিক শক্তির মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা থাকে তা ভেঙে যায়। দর্শকের জীবনের লক্ষ্যই হলো এমন আলোর সাথে থাকা এবং ঈশ্বরের সাথে একটি স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।"[৯]

বিশ্বের রাজনৈতিক আদর্শ বহু সভ্যতার সমন্বয়ে একক সাম্প্রদায়িক সাম্রাজ্যের উপযোগী নয়। বরং জীবনাদর্শ, মন, বুদ্ধি, অভ্যাস ও রীতিনীতির বৈচিত্র্যে ভরপুর জাতিসমূহ পরস্পর শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য

ও সহযোগিতা সহকারে প্রত্যেকের স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যের স্বকীয়তা হানি না ঘটিয়ে, বিশ্বকে উপহার দিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সার্বজনীনতা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার সমন্বয়ে আমাদের আদর্শ বিশ্ব সহযোগিতা যা বিশ্ব-পরিবারের প্রত্যেক শাখাকে মানবজাতির বৃহত্তর জীবনে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও আত্ম উপলব্ধির সুযোগ দেয়। যখন দুই-তিনটি ধর্মমতের প্রত্যেকটি দাবি করেন যে, তিনিই একমাত্র সত্যের কেন্দ্রস্থলে আবিভূর্ত হয়েছেন এবং তাঁর ধর্মমতকে গ্রহণ করাই একমাত্র স্বর্গের পথ গ্রহণ তখন অবশ্যম্ভাবী সে সংঘাত একটি ধর্ম অন্য সকলকে দাঁড়াতে দিতে চাইবে না এবং যতক্ষণ না পৃথিবীটা ধুলিভস্মে পরিণত হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই পতিপত্তি লাভ করতে পারবে না। অন্য সকল ধর্মাবলম্বীকে আমার পথে নিয়ে আসা ধর্মজগতে বলশেভিকতা, যা নিবারণ করতে আমাদের সচেষ্ট হতেই হবে। আমরা তা করতে পারি যদি হিন্দুদের সমাধানের মত কিছু একটা গ্রহণ করি যা বিভিন্ন ধর্মসমূহের মধ্যে ঐক্য রচনা করবে। এক ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ ও স্বীকৃতির ভিত্তিতে এটা করা সম্ভব।

আমরা সাংগঠনিক ঐক্যে নয়, চেতনার ঐক্যে মিলিত হই। যে ঐক্য কেবল ব্যক্তিজীবনের জন্য নয়, প্রত্যেকটি কার্যকর সমাজজীবনের জন্য যথেষ্ট স্বাধীনতা নিশ্চিত করে। কারণ প্রায় সকল ঐতিহাসিক জীবন ধারা ও চিন্তা চেতনাই অভিজ্ঞতা ও ভগবতকৃপার ফলশ্রুতি বলে দাবি করা যেতে পারে। একটি ধর্মমত যদি অন্য ধর্মমতকে অধিগ্রহণ করে নেয় তাহলে বিশ্বটা বড় দুঃখের হয়ে যাবে। ঈশ্বর চান একটা উদার সমঝতা; বর্ণহীন সমতা নয়। হিন্দুদের বিচিত্র চেতনা হিন্দু চেতনাকে সহস্র হস্তযুক্ত পর্বত প্রমাণ বিরাট করে তুলেছে। প্রতিটি হাতই তার কর্তব্য পালন করছে এবং ঈশ্বরভাবে ভাবিত হচ্ছে। প্রতিটি বস্তুই নিজ নিজ পথে স্বর্গীয় ঐকতানে সংযুক্ত। রাগ-রাগিনীর বৈচিত্র্য মিলেই সৃষ্ট সেই ঐকতান। হেরাক্লিটাস যেমন বলতেন আমাদের আদর্শই বৈচিত্যময় ঐকতান।

ভবিষ্যতের ধর্ম সংঘাতে হিন্দু সমাধানের ব্যবহার একরূপ সুনিশ্চিত বলে আমার কাছে মনে হয়। পছন্দমত জীবনের গতি নির্বাচনের যথেষ্ট স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের স্থান এখানে রয়েছে। আত্মনির্বাচিত নয় এমন কিছুই ভাল নয়। আত্মসংকল্পিত নয় এমন সংকল্প মূল্যহীন। বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন ধর্মগুলো একে অন্যের প্রতি ধীরে ধীরে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে শিখছে।

ধর্মসমূহের পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে এখন আমরা পরিষ্কার চিন্তা করতে শিখেছি। এখন আমরা বিভিন্ন ধর্মসমূহকে পরস্পর অসঙ্গত মনে করছি না। বরং একই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য পরস্পর অপরিহার্য মনে করছি। অন্য ধর্মসমূহের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার ফলে কিছু ভ্রান্তবিশ্বাস দূর হয়েছে। যেমন কোন বিশেষ ধর্মই শুধু ধৈর্যশীল, সাহসী ও নি:স্বার্থ প্রেমিক সৃষ্টি করছে ও সৃজনীশক্তি সৃষ্টি করছে ইত্যাদি ধারণা কারো কারো কাছ থেকে অপসারিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি মহান ধর্মই তার অনুসারীকে ভাবাবেগের স্ফীতাবস্থা থেকে, প্রবৃত্তির তৃষ্ণা থেকে ও রুচির অন্ধতা থেকে মুক্ত করছে। কাদামাটিতে নিবন্ধ শেকড় গাছেও যেমন চমৎকার ফুল ফুটে, তেমনি চরম অশিষ্ট ধর্ম ও মহাজাগতিক পরিকল্পনায় তার স্থান দখল করে আছে। মরমীদের ক্রমবর্ধনার প্রসার ধর্মীয় তত্ত্বকে অধীনস্থ করছে।

৪.৩ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-১

রাধাকৃষ্ণণের মতে হিন্দু মতবাদের বাস্তব দিকটাতে যাওয়ার আগে হিন্দু নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত কিছু অভিযোগের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। মায়াবাদ জগতের বাস্তবতা অস্বীকার করে এবং সমস্ত নৈতিক সম্পর্ক অর্থহীন মনে করে। মায়াবাদের মতে, বিশ্ব-প্রকৃতি অবাস্তব এবং মনুষ্য ইতিহাস মোহজনক সময়ের কোন মূল্য নেই। জীবনের কোন তাৎপর্য নেই। এই মায়া, যা কোনভাবে মানুষের উপর এসে গেছে, তা থেকে মুক্তি লাভই সকল সাধনার পরিণতি।

বৈদিক চিন্তাবিদগণ এই বিশ্ব সম্বন্ধে একটা বাস্তব ধারণা প্রবর্তন করেছেন। উপনিষদসমূহে জগতের আপেক্ষিক সত্যতা দেখানো হয়েছে। একটি বাদ্যযন্ত্র ও তার সুর, মাটি ও সোনার উপাদান এবং মাটি ও সোনা থেকে তৈরি বস্তু এই মমার্থ প্রকাশ করে যে, জাগতিক সবকিছুর মূল্য আছে কারণ সবই আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক হতে পারে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেছেন, ঈশ্বর একজন মহামায়িক এবং এই আশ্চর্যজনক জগতটি তাঁর সৃষ্টি। ঈশ্বর রূপ ধারণ করেন যে রূপের কোন অস্তিত্ব প্রতারিতদের কাছে ব্যতীত আর কোথাও নেই-উপনিষদ একথা স্বীকার করে না। হিন্দুদের মতে বহুলাংশে প্রচলিত বিভিন্ন আস্তিক্যবাদী পদ্ধতি মায়াবাদ স্বীকার করে না। শঙ্করাচার্য মায়াবাদ প্রবর্তন করেছেন। আবার শঙ্কারাচার্যকে অনেকাংশ প্রামাণ্য হিন্দু দর্শনের প্রতীক মনে করা হয়।

এটি সম্পূর্ণ সত্য যে, শঙ্করাচার্য এই জগতকে কেবলই মায়া মনে করেন। তিনি তাঁর মতবাদের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দিয়েছেন। স্থানের সহাবস্থান বা কালের পূর্বাপর সম্বন্ধ প্রভৃতি বহুবিধ অভিজ্ঞতা সবই অসম্পূর্ণ, আংশিক এবং সামঞ্জস্যহীন। স্থান-কালের জগতকে একটি ধারাবাহিক ঐক্যে গ্রথিত করা যায় না। এইটা জগতের অপূর্ণতা ও অবাস্তবতাকে নির্দেশ করে। বাস্তব, সকল পরিবর্তন মুক্ত এবং নিত্য। ঐতিহাসিক বিবরণ সকল সময় বিদ্যমান থাকে না। প্রতি মুহূর্তেই এর মৃত্যু ঘটে। এই ভাবকে আমরা নিজেদের মত করে ব্যক্ত করতে পারি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই ঐতিহাসিক বিবরণ সমাপ্ত হয়ে যায়। যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত না হয়, যদি অসাধ্যের সাধনায় জীবন বিড়ম্বিত হয়। জীবন যদি গন্তব্যহীন পরিভ্রমণ হয় তবে বিশ্ব প্রক্রিয়াটাই অর্থহীন। এটি অসীম একঘেঁয়ে গান নয়। গানের মধ্যে পূর্ণতা বলে একটি জিনিস থাকা উচিত। যদি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই সব না হয় একটি অসাধ্য আদর্শের চেষ্টার যদি আমরা ধ্বংস হয়ে না যাই তাহলে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় কোন একটা বিন্দুতে আমাদের পূর্ণতা প্রাপ্তি হবেই এবং এইটি হবে আমাদের ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এইটিই হবে আমাদের জন্ম মৃত্যু ও সংসারের অতীত হওয়া। ইতিহাস একটি উদ্দেশ্যের সাধনা। আমাদরা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের নিকটতর হচ্ছি। ব্যক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধিই মোক্ষলাভ। পূর্ণতা লাভই ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সমাপ্তি।

যখন একজন মানুষ সিদ্ধি লাভ করে তখন তার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্বজনীনতা গড়ে উঠে। যা হচ্ছে পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার কর্মযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দুর ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। যখন সমস্ত বিশ্ব ভোগে নিয়োজিত তখন সিদ্ধপুরুষ কেন্দ্রবিন্দুর ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে। যখন সমস্ত বিশ্ব ভোগে নিয়োজিত তখন সিদ্ধপুরুষ পূর্ণতার শান্তি সমাহিত। যে সকল বিরাট সত্য এই তারকাময় ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের জন্য নীরবে নিশ্চিন্তে কলঙ্কের মত কাজ করে তারা তাদের গন্তব্যে পৌঁছবে।

বিশ্ব আত্মধ্বংসের মাঝেই নিজের পূর্ণতা আনয়ন করে। বিশ্ব ধ্বংসের চিন্তা অনন্ত ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অস্বীকার করে না। এই যবনিকা পতন হবে কিন্তু আরেকটি সম্ভাবনা, আরেকটি দৃশ্যপট বা আরেকটি নাটক শুরু হতে পারে এবং যুগ যুগ ধরে এভাবে চলতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণ শঙ্করের ধারণাকে বিভ্রমাত্মক মনে কর ঠিক হবে না। শঙ্কর বিজ্ঞানবাদের আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার করেন এবং বস্তুত অতিরিক্ত মানস বাস্তবতা স্থাপন করেন। তাঁর তত্ত্ব দৃষ্টি সৃষ্টিবাদ নয়, বোধানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠে এবং তদাভাবে হারিয়ে যায়। আমরা বস্তুকে উপলব্ধি করি কেবল তার

অপচ্ছায় অনুশীলন করি না। শঙ্কর স্বপ্নকে জাগ্রত অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা করে দেখেন এবং এ দুয়ের ভুল বুঝাবুঝি থেকে আমাদের সাবধান করেন। জাগ্রত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্তি যুক্তিসম্মত জ্ঞানের দ্বন্দ্ব নেই। যতদুর আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। বস্তু চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শঙ্করের অবিদ্যাতত্ত্বও এই ধারণাকে নিশ্চিত করে। কারণ অবিদ্যা কারো ব্যক্তিগত পেশা নয়। এই সীমাবদ্ধতার মহাজাগতিক নীতি হিসেবে সকলের মাঝেই আছে। এটি সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জগতের কারণ। অবিদ্যা সকলের মাঝে সাধারণভাবে অবস্থান করে। কোন একটি মানুষের মুক্তি সমস্ত বিশ্বের ধ্বংস আনয়ন করে না। কেবল সত্য-মিথ্যা বা অবিদ্যা বিদ্যায় রূপান্তরিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন,

> "The essence of religion is not in the dogmas and creeds, in the rites and ceremonies which repel many of us, but in the deepest wisdom of the ages, the philosophis perennise, sanatan Dharma, which is the only guide through the bewildering chaos of modern thought."[১০]

রাধাকৃষ্ণণের মতে, হিন্দু দর্শনানুযায়ী ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব একটি ধ্রুব যা ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় (Degree) গৃহীত। ঈশ্বরালোকে আলোকিত নয় এমন কিছুই নেই। তবু অনাঙ্গিকের চেয়ে আঙ্গিকে তাঁর বিকাশ বেশি। অচেতন থেকে চেতনে বিকাশ বেশি, নিম্নস্তরের প্রাণীর চেয়ে মানুষ বেশি এবং অসৎ মানুষের চেয়ে সৎ মানুষ বেশি। কিন্তু তবুও জগতের যা কিছু মন্দ তাও অনৈশ্বরীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিংবা নরকের আগুনে দগ্ধ হবার জন্য বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। হিন্দু দর্শন সর্বত্রই ঈশ্বর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বর থেকে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। আর উপায় নেই বলে এমন কথা কখনও বলা যায় না যে সব কিছুই ঈশ্বর যা আমরা সমালোচকদের মুখে শুনি। পিকাডেলী নিশ্চয়ই ঈশ্বর নয়, যদিও ঈশ্বর ছাড়া পিকাডেলীর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। নিকৃষ্টতম মানুষের মাঝেও শক্তি নিহিত আছে। মহাপাপীর কাছেই ঈশ্বরের দীর্ঘস্থায়ী অস্ত্র সকল বিদ্যমান। কারোও সত্যিকার অর্থে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। প্রতিটি পাপীরও একটা ভবিষ্যৎ আছে এবং প্রতিটি সাধুরও একটি অতীত ছিল। কেউই এতো ভাল বা এতো মন্দ নয় যত সে নিজেকে মনে করে। জগতের মহাত্মাগণ সাধারণ মানুষের এবং পাপীদের মধ্যে ঐশ্বরীয় শক্তি জাগ্রত করার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেন কর্মের ধারণাকে অনেক সময় মানুষের স্বাধীনতার পরিপন্থ মনে করা হয় এবং এটিকে মানুষের সকল নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি

বলেও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কর্মের নীতি মনুষ্য স্বাধীনতার বিরোধী নয়। এটি হচ্ছে বিজ্ঞানের নীতি যা জাগতিক রীতিকে নিজের পক্ষে ব্যাখ্যানের স্থান দখল করে নেয়।

প্রকৃতির বিধান তার নিজস্ব অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত। কারো ব্যক্তিগত সংস্কার বা ভাবাবেগ দ্বারা নয়। চন্দ্র সূর্য তাদের নিজস্ব গতি পথে চলে। বার্ষিক ঋতু সকল প্রথানুযায়ী পরিবর্তত হয়। কারণ তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক শক্তি দ্বারা তারা নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজনের তাগিদে সর্বত্রই প্রবহমান। ব্রহ্মান্ডটি নিয়মের দ্বারা আষ্টে পৃষ্টে বাঁধা। কর্মতত্ত্ব নিয়মবিধি স্বীকার করে। শুধু বাহ্য প্রকৃতিতে নয়, মন এবং নৈতিক ক্ষেত্রেও স্বীকার করে। কর্ম প্রকৃতি ও সমাজে সমভাবে ব্যক্ত। প্রতিমুহূর্তেই আমরা আমাদের চরিত্র ও ভাগ্য নির্মাণ করে চলেছি। কোন কর্ম প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয় না এবং বৈগুণ্যজনিত প্রত্যবায়ত্ত হয় না। অল্পমাত্র কর্মানুষ্ঠানও আমাদিগকে মহাবিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। আধ্যাত্মিক জগতে আমরা যা উপার্জন করেছি তা এই দেহের সঙ্গে বিনাশ হয়ে যাবে না।

ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই নির্ধারিত নয় আমরা কেবল একটা প্রাক-কল্পিত পরিকল্পনায় উলট পালট করছি না। ঈশ্বরের পক্ষে পরিপূর্ণ পরিনামদর্শিতা বলে কিছুই নেই। কারণ আমরা সকলেই তাঁর কর্মী। ঈশ্বর কেবল আমাদের উর্ধ্বে বা বাইরে নন। তিনি আমাদের মধ্যেও। আমাদের মধ্যেকার আধ্যাত্মিকতার সদ্ব্যবহার করতে পারলে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। বিবর্তন অসম্ভব নয়। জীবন একটি কর্মপ্রবণ উন্নয়নশীল প্রক্রিয়া, যান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। রাধাকৃষ্ণণের মতে হিন্দু মতবাদ যতটুকু একটা বিশেষ ধরনের চিন্তা বা দর্শন তার চেয়ে বেশি একটি জীবনাদর্শ। হিন্দু মতবাদ যেমন চিন্তার জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় তেমনি আচরণে একটা কঠোরতাও মেনে চলে। আস্তিক কি নাস্তিক, সন্দেহবাদী কি অজ্ঞেয়বাদী, সকলেই হিন্দু। যদিও তারা হিন্দু জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি মেনে চলেন। হিন্দুরা ধর্মীয় সাদৃশ্যের চেয়ে নৈতিক ও অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি বেশি জোর দেন। সৎ কর্মের অধিকারী ব্যক্তি কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হননা। খুব বাস্তব অর্থে তত্ত্ব আচরণকে অনুসরণ করে। আমাদের তাত্ত্বিক বিশ্বাস ও দার্শনিক মতবাদ যাই হোক না কেন আমরা এ বিষয়ে একমত যে আমাদের সৎ ও দয়ালু হওয়া উচিত। হিন্দু মতবাদ নৈতিক জীবনের উপর জোর দেয় এবং নৈতিকতা বা ধর্মের আশীর্বাদ পুষ্ট সকলের সঙ্গ

টানে। হিন্দু একটি ধর্ম সম্প্রদায় নয়, শুদ্ধ নৈতিক জীবন ও সত্যানুসন্ধানে ব্রতী সকলের একটি সম্বিলনী।

ধর্ম হচ্ছে সৎকর্ম। ঋকবেদে 'ঋত' হচ্ছে ব্রহ্মান্ডের যথার্থ স্বরূপ। এটি সত্য ও ধর্ম উভয়ের মাঝে বিদ্যমান। সত্য বস্তুর যথার্থতা আর ধর্ম বিবর্তনের নিয়ম। 'ধৃ' ধাতু থেকে উৎপন্ন ধর্ম শব্দটির অর্থ ধারণ করা। বস্তু যা ধারণ করে বা যা বস্তুকে রক্ষা করে তাই ধর্ম। প্রতিটি জীবনব্যবস্থার বা প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই একটি ধর্ম আছে। ধর্ম বা গুণ বস্তুর সত্যতার সাদৃশ। অধর্ম বা দোষ এর বিপরীত। অর্থনৈতিকতা সত্যের বিরোধী। সত্যই জগতের পরিমণ্ডল, সত্যই জগতের নিয়ন্তা।

ইচ্ছাই মানুষের কর্মের চাবি। মনুষ্যজীবন কতকগুলো আকর্ষণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রতিটি আকর্ষণেরই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এবং প্রতিটি পরিতৃপ্তির জন্য মানুষ একেকটি কর্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যগুলো একটি ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান। যদি ইচ্ছাগুলোও স্বতন্ত্র এবং পরস্পর যোগসূত্রহীন হতো তাহলে অভিন্ন অভিব্যক্তিগুলোও অসমন্বিত হতো এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পারিবারিক জীবনের খুব কমই সম্পর্ক থাকতো। তাতে শিল্প সম্পর্ক নৈতিকভাবে নিরর্থক হয়ে পড়তো। ধর্মীয় কার্যকলাপ নিরপেক্ষতার প্রতি উদাসীন হতে পারে। কিন্তু মানুষ পূর্ণাঙ্গ এবং তার সমস্ত কাজ কর্মের একটি সার্বিক ঐক্য আছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আছে যৌন চেতনা, মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের বৃত্তি। ক্ষমতা ও সম্পত্তি অর্জনের প্রবণতা এবং অতীন্ত্রিয় অনুভূতি লাভের প্রচণ্ড আগ্রহ। বিভিন্ন কার্যাবলী পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংশোধনীয়। এই উপাদানগুলো মনুষ্যজীবনে পরস্পর নির্ভরশীলতায় কাজ করে। জীবন যদি একক হয়, তাহলে এর একটি একক নিয়মবিধি থাকবে, যা ধর্মের চারটি লক্ষ্য ব্যক্ত করে। এই লক্ষ্যগুলো হচ্ছে ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতা, অর্থ বা সম্পদ, কাম বা শৈল্পিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এবং মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্য। হিন্দু আদর্শ মনের বাসনাকে শাশ্বত প্রক্ষিতের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এ যেন স্বর্গ মর্ত্যের রাজ্যদ্বয়কে পরস্পর যুক্ত করা।

অর্থ মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সাথে সম্পদ ও ক্ষমতালাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা গড়ে তালে। ধনোপার্জনের আগ্রহ মনুষ্য প্রকৃতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। মনুষ্য– মনের মূল

গঠনকে পরিবর্তন করতে না পারলে ধনোপার্জনের ধারণাও পাল্টানো যাবে না। অনেকের মতে, সম্পদ হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং সমাজের অন্যদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম ।

ন্যায় পথে অর্জিত কাঙ্খিত সুখ-শান্তি পরিণামে মুক্তি আনতে পারে যদি এই কাঙ্খিত সুখ ন্যায় পথে অর্জিত হয়। এর জন্যে প্রয়োজন নৈতিক শৃঙ্খলা। মুক্তির জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবিধান। মুক্তি অর্জন এবং ভোগের জন্য আমাদেরকে কিছু ত্যাগ করতে হয় এবং আমাদের ইচ্ছাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত করতে হয়।

রাধাকৃষ্ণণের মতে মোক্ষ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ। হিন্দুদর্শন বলে মানুষ শুধু খাদ্যে বাঁচতে পারে না, শুধু কাজ, টাকাকড়ি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বাঁচতে পারে না। মানুষ তার আত্মচেতনায় বাঁচে। মোক্ষ হচ্ছে আত্মার দাসত্বমোচন- যে চেতনা আমাদের মধ্যে আছে তার পূর্ণতা লাভ। এটি হচ্ছে সত্যিকারের তৃপ্তি। সকল কাজ এই তৃপ্তি লাভের জন্য। এই মুক্তিলাভের পদ্ধতি সম্পর্কে হিন্দু চিন্তাবিদগণ ক্যাথলিকদের মানসিকতা প্রয়োগ করেন। আকাশে যখন পাখি উড়ে বা সমুদ্রে যখন মাছ চলে তখন পেছনে কোন চিহ্ন রেখে যায় না। ঈশ্বর সাধনায় সত্য সন্ধানীর পথও ঠিক তেমনি।

ঈশ্বর পথে যাত্রার বিভিন্ন পথকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়-জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম। এ তিনটি পরস্পর সম্পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন নয়। তবে প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র দিক আছে। জ্ঞান মানে বুদ্ধি বিচক্ষণতা নয় বা যুক্তিসিদ্ধ ক্ষমতা নয়। জ্ঞান মানে আয়ও অভিজ্ঞতা। আমরা পাপ থেকে দূরে থাকতে পারি কেবল যদি ঈশ্বর সান্নিধ্যে বাস করি। যদি আমাদের শুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সঠিক কর্ম সম্পাদিত হবে। সত্য ভুল করতে পারে না। ভক্তির পথ খুব জনপ্রিয় পথ। পাপী-পুন্যাত্মা, পন্ডিত-মূর্খ, জ্ঞানী-নির্বোধ সকলের জন্যই ভক্তির পথ বড় সহজ। প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন, ব্রত-পার্বণ, ভাব বিনিময় ও আত্মপরীক্ষা এ সমস্তই ভক্তিপথের বিধান আছে। সর্বোচ্চস্তরে ভক্তি জ্ঞানের সাথে মিশে যায়। উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হয় শুদ্ধকর্ম বা সুন্দর গুণময় জীবন।

রাধাকৃষ্ণণের মতে কোন কোন খ্রিস্ট বা বৌদ্ধ মতবাদ সন্ন্যাস জীবনকে সংসার জীবনের চেয়ে উচ্চতর বিবেচনা করেন এবং সমস্ত জগতকে এক মঠের অধীনস্থ করে রাখতে পছন্দ করেন। হিন্দু মতবাদ

সন্ন্যাস জীবনকে প্রশংসা করলেও গৃহস্থকে ঘৃণা করেন না। উভয়েরই প্রয়োজন। প্রয়োজন বলে উভয়ই প্রশংসনীয়। পুষ্প মুকুল পাতাকে অস্বীকার করে না, সাধানিয়ম হচ্ছে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্তরে যাওয়া। মুক্ত পুরুষ জাগতিক কল্যাণের প্রতি উদাসীন নন। বুদ্ধদের সম্পর্কে এরূপ একটি কথা আছে যে যখন তিনি নির্বাণ লাভের পথে তখন তিনি ফিরে এলেন আর প্রতিজ্ঞা করে বসলেন– যতদিন পর্যন্ত একটি প্রাণীও দুঃখ-কষ্টে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তিনি নির্বানের দরজা পার হবেন না। একই কথা আছে শ্রীমদ্ভভগবতে আমি পূর্ণতা চাই না, অষ্টসিদ্ধি চাইনা, পুনর্জন্ম্য থেকে যুক্তিও চাই না। আমি চাই সকল প্রাণীর দুঃখ তুলে নিতে, যাতে সকলে হয় শোক মুক্ত দুঃখ মুক্ত। যোগীরাজ মহাদেব বিশ্ব রক্ষার জন্য বিষপান করেছিলেন। মুক্তির নিম্নতর পর্যায় হচ্ছে 'দুঃখ' 'ত্যাগ' এমনকি মৃত্যুবরণের সাহসিকতা। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "Religion is a Strenuous endeavour to apprehend truth."[১১]

রাধাকৃষ্ণণের মতে, জীবনের চতুরাশ্রম পরিকল্পনা আজও হিন্দুদের মনকে পুলকিত করে। গণমানুষে প্রতিফলিত সমাজের সাধারণ চরিত্র সবসময় উত্তম দেখা যায় না। কোন সমাজের আদর্শ, প্রকৃত চরিত্র ও সকল শ্রেষ্ঠত্ব সাধারণতঃ প্রকাশ পায় সেই সমাজের নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাঝে। সমগ্র সমাজে তাঁদেরকে উদাহরণস্বরূপ মনে করে। যখন প্রদীপের সলিতাটির অগ্রভাগ জ্বল জ্বল করে তখন সমগ্র প্রদীপটাই জ্বলছে মনে করা হয়।

৪.৪ হিন্দু (ধর্মীয় দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি) মতামত-২

রাধাকৃষ্ণণের মতে, বর্ণ হিন্দু মনের ব্যাপক সমবায়ী প্রকৃতির, সহযোগিতার ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উদাহরণ। যদিও আপাতবিরোধী মনে হয়, তবুও একথা সত্য যে, বর্ণবিশ্বাস সহনশীলতার ফলশ্রুতি। আজকের দিনে বর্ণ একটি অত্যাচারের হাতিয়ার বর্ণবাদে সীমাহীন অসহনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। আজকের দিনে বর্ণপ্রথা অসাম্য স্থায়ী করছে এবং সমাজকে শতধা বিভক্ত করে ফেলছে। এ সকল দুর্ভাগ্যজনক ফল লাভই বর্ণপ্রথার মূল উদ্দেশ্য ছিলনা। ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের যেরূপ প্রভুত্ব আছে সেরূপ ক্ষমতা যদি থাকতো তাহলে নিশ্চিত তারা বর্ণপ্রথাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।

আজকের দিনে বর্ণপ্রথার উপর যে কোন জরিপে এর জটিল মৌলিকতা ধরা পড়বে। বর্ণ নানা প্রকারের-গোত্রগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত, জীবিকাগত, অঞ্চলগত ইত্যাদি। কতকগুলো স্থান ত্যাগের

ফলে উদ্ভূত হয়েছে। কোন বর্ণের মানুষ যখন দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসত করে তখন অনেক সময় একটি নতুন বর্ণের সৃষ্টি হয়ে যায়।

সংস্কৃত শব্দ 'বর্ণ' মূলত রং থেকে সৃষ্ট। যদি আমরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখি এই দেশটি একের পর এক বিদেশী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি ইতিহাসের শুরুতেও ভারতে বহুজাতীয় মানুষের বাস ছিল কৃষ্ণবর্ণের প্রাগৈতিহাসিক গোত্রগুলো, বলিষ্ঠ দ্রাবিড়গণ, হলুদ চামড়ার মঙ্গোলিয়গন এবং শুভ্র আর্যগণ। শীঘ্রই ভারতের সকল জাতির মানুষ ফরাসি, গ্রিক ও সাইদিয়ানদের সংস্পর্শে আসেন। নবাগতদের কেউ কেউ ভাবতে স্থায়ী বসতি লাভ করেন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ভারতের মত এতো নরগোষ্ঠীগত সমস্যা নেই। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, গোষ্ঠীগত সংঘাত সমাধানের বিকল্প পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-বিধ্বংস, দাসত্ব, সনাক্তকরণ ও ঐক্যবিধান। বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পদ্ধতিটি বহুল ব্যবহৃত। এতে অগণিত সম্প্রদায়ের চির বিলুপ্তি ঘটান হয়েছে। মনুষ্য জীবনের এমন ধ্বংস সাধনের কোন যুক্তি আছে কি? কোন সংস্কৃতির বিলুপ্তিতে কী ক্ষতি হয় সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা আছে কি? এটি সত্য যে রেড ইন্ডিয়াগণ বিশ্বসমৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখতে পারেনি। কিন্তু ঈশ্বর ইচ্ছায় কোন সময় রেড ইন্ডিয়াগন কোন অবদান রাখতে পারতো কিনা সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে কি? আমরা নিজেদের সম্পর্কে বিশ্ব সম্পর্কে বা ঈশ্বর ইচ্ছা সম্পর্কে এতোটুকু জানি যে আমরা বলব আমাদের সভ্যতা ও রীতিনীতি অন্যান্য সভ্যতা ও রাজনীতি থেকে ঢের ভাল? অন্যদের যা সম্ভাবনা আছে তার চেয়েও ভাল? একটি জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আমরা আগে থেকে পরিমাপ করতে পারি না। সভ্যতা একদিনে গড়ে উঠে না। আজ আমার এ কথা বলার সাহস আছে যে, যদি ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হতেন এবং যদি আমরা আমাদের অজ্ঞাত বিষয়ে আরও কম উগ্র হতাম তাহলে বিশ্ব রেড ইন্ডিয়ানদের অবদানে সমৃদ্ধতর হতে পারতো। মানবজাতির প্রাচীনত্ব এবং মনুষ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের তুলনায় আমাদের সভ্যতা নবীন। জুলিয়াস সিজারের ইঙ্গিতে আমরা বুঝি আজকের মানুষের অগ্রগামী সৈনিক, মহান ব্রিটিশ জাতির কোন কোন পূর্বপুরুষেরা তত উন্নত ছিলেন না।

যে ব্রিটেনের বন্য পূর্বপুরুষগণ ধর্মীয় আচরণে চামড়ার পোশাক পরতেন এবং দেব দেবীর প্রীতি ভাজনের জন্য জ্যান্ত মানুষকে অগ্নিদগ্ধ করতেন সেই জাতির এতো উন্নতির সম্ভাবনা আছে একথা কে

বুঝতে পেরেছিল? জার্মানির প্রাচীন অধিবাসী টিউটনদের পূর্ব পুরুষদের সঙ্গে পরিচিত কেউই কোনদিন অনুমান করতে পারেনি যে, এ জাতি একদিন বিশ্বের সঙ্গীত ও অপার্থিব বিষয়ে চমৎকার অবদান রাখবে। মানুষের সম্ভাবনা এতো বেশি এবং জাতিগত মৌলিক বৈচিত্র্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এতো সীমিত যে, নিষ্ঠুর অবদমন ও বিধ্বংস সাধন কোন ক্রমেই জ্ঞানের অংশ হতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃতি ও ইতিহাসের সামান্য জ্ঞান থাকলেই আমরা বন্য, আদিম, অসভ্য ও অনুন্নত মানুষের সঙ্গে সহানুভূতিশীল হতে পারব। তাঁরাও তাঁদের ভাবে সংকীর্ণ পথ ধরে আলোর দিকে অগ্রসরের সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে পারবেন। প্রতিটি জাতি বা গোত্র তার উন্নয়নের ধাপে যতই অনুন্নত হোক না কেন সে একটি বিশেষ ধরনের মানসিকতার প্রতিভূ। মানবের স্বার্থে ও মানবতার স্বার্থে প্রতিটি মানসিক ধরনেরই যথেষ্ট বিকাশ ও উন্নয়নের প্রয়োজন। কোন জাতিই একা বাঁচতে পারে না। একা মরেও না; এতদ্ব্যতীত জাতিসমূহের পশ্চাদপদতার কারণ পরিবেশগত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। বাহ্যিক উদ্দীপনার প্রয়োগ হলে যে কোন জাতি যথেষ্ট ক্ষমতা ও অভিযোজন দেখাতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, "হিন্দু মতবাদের উপর বহিঃশক্তির চাপের উত্তর হচ্ছে 'বর্ণ'। এইটি ছিল যন্ত্র যার দ্বারা হিন্দু মতবাদে গৃহীত বিভিন্ন গোত্রের সংস্কার সাধিত হয়েছে।"[১২] যে কোনভাবে পরিপূর্ণ একটি গোষ্ঠীই একটি 'বর্ণ'। যখনই একটি দল একটি শ্রেণী বা একটি জীবনধারা প্রকাশ করে, তখনই একটি বর্ণের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মতবাদের ভেতর যদি প্রচলিত মতের একটি বিরুদ্ধ মত সৃষ্টি হয় এবং প্রসারিত হয়, তবেই একটি নতুন শ্রেণী বা বর্ণের উদ্ভব হয়। হিন্দুরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীসমূহকে যুক্তিসঙ্গতভাবে যত বিভাজন করা যায়, ততই করেছে। যখনই কোন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তখনই তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। হিন্দু মতবাদে আছে নিয়ন্ত্রিত জটিলতা আর ঐক্যবদ্ধ বৈচিত্র্য। এই ঐক্যবদ্ধ বৈচিত্র্যই হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির ধর্ম।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, "বর্ণ বিধান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করে। আধ্যাত্মিক আদর্শের উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য ব্রাহ্মণদের কাজ করতে হতো না। ব্রাহ্মণকে দান করার জন্য অন্যদের উৎসাহিত এমনকি নির্দেশিত করা হতো।"[১৩] ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ ও পূর্বসংস্কার মুক্ত মনে করা হতো। ব্রাহ্মণদের নিরপেক্ষ ও প্রশান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থাকতো।

ব্রাহ্মণেরা কোন রাষ্ট্রের অধীন নন। যদিও রাষ্ট্র প্রয়োজনে ব্রাহ্মণদের উপদেশ নিত। রাষ্ট্র সমাজের একটি শ্রেণী হিসাবে অবশ্যই সাংগঠনিকভাবে সৈনিক। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট কাজ ছিল শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করা এবং বিভিন্ন বর্ণের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন নিশ্চিত করা। সরকার একটি নির্বাহী সংগঠন যা সমাজের সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত ব্রাহ্মণেরা সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে সমাজের প্রকৃত স্বার্থ নির্দেশ করতেন।

অধ্যাত্ম আদর্শ থেকেই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পটভূমি তৈরি হয়। এই নিয়ম রাষ্ট্রকে সৈনিক স্বৈরতন্ত্র থেকে রক্ষা করে। সার্বভৌম ক্ষমতা শাসনের অনুকূলে নয়। বরং সাধারণ মানুষের অনুকূলে। ধর্ম জনগণের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আর সরকার সেই সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করার একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার। বাণিজ্য আর পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রের হাতে নয়। এ দুটোতে স্বাধীনতা দেয়া হয়। রাষ্ট্র, শিল্প-সাহিত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করত না। যদিও এগুলোর সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে দিত। আজকের দিনে রাষ্ট্রের কাজ প্রায় অসীম বলতে গেলে সমাজ জীবনই রাষ্ট্রের হাতে।

হিন্দু মতবাদের নীতিসমূহ আক্রমণবিরোধী হলেও, এই সমাজে শক্তি প্রয়োগে নিবেদিত একটি শ্রেণীর স্থান রয়েছে যতদিন পর্যন্ত মনুষ্য প্রকৃতি বর্তমান মনুষ্য প্রকৃতির মত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত সমাজ সভ্যতার উচ্চতম পর্যায়ে উঠতে অক্ষম, ততদিন পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন থেকেই যাবে। যতদিন পর্যন্ত সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলাবিরোধী মানুষ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সমাজের নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজবিরোধী শক্তির প্রতিরোধ প্রয়োজন। যখন অভ্যন্তরীণ কোন্দল বা যুদ্ধবিগ্রহে সমাজের অবস্তা দোদুল্যমান হয় তখন বিরুদ্ধ সংগ্রামের জন্য এ সকল সমাজবিরোধী শক্তি একত্রিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের সমাজব্যবস্থার আপেক্ষিক সচেতনতার জন্য ধন্যবাদ-নয় দিনের এক সাধারণ ধর্মঘটে খুব কমই উশৃঙ্খলা ও অপরাধ প্রবণতা দেখা গেছে।

বর্ণ প্রথার জন্য সামাজিক নিয়মগুলো নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা মুক্ত হতে হবে। সে নিয়মগুলোতে থাকবে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। সমাজ জনগণের শত্রুতার স্থান নয়। বর্ণগুলো একে অন্য প্রতিযোগিতার জন্য নয়। জন্মগত বর্ণের শিক্ষা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অন্য বর্ণের জীবিকা ও জীবন ধারায় নিজেকে

তৈরি করে নিতে বেশ কষ্ট হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব কর্মের (স্বধর্মের) যোগ্য স্বভাব থাকে। সেই কর্মের পরিবর্তনে উৎসাহ দেয়া হয় না। স্বভাব যদি কর্ম পরিবর্তনের উপযোগী না হয় তাহলে কর্ম পরিবর্তনে ব্যক্তিত্বের বিনাশ সূচিত হতে পারে। জীবনধারার পরিবর্তন করার ইচ্ছা থাকলেই তা করার ক্ষমতা আমাদের নাও তাকতে পারে। ইচ্ছা থাকলেই স্বভাবকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। চার বর্ণে আছে চিন্তাশীল, কর্মশীল ও সহানুভূতিশীল মানুষ এবং এমন কিছু মানুষ যাঁদের মধ্যে এই তিনটির কোনটিই সবিশেষ উপস্থিত নেই।

অবশ্য এইগুলো প্রধান প্রকৃতি; একমাত্র প্রকৃতি নয়। বাস্তবে এর মধ্যে সব রকম অনন্য সমন্বয় আছে যাতে করে প্রত্যেক বর্ণে সংকর বা মিশ্রগুণের সৃষ্টি হয়েছে। গুণ অনুসারে কর্ম হয় এবং আমাদের স্বভাবজাত গুণাবলী ধীরে খুব ধীরে পরিবর্তিত হয়। সেহেতু কেবলমাত্র উত্তরাধিকার আর শিক্ষা দিয়েই কর্ম নির্ধারিত হয়। যদিও আমাদের যেহেতু আমরা প্রত্যেকটি মানুষের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী কর্ম নির্ধারণ করতে পারি না, সমাজে উত্তরাধিকার সূত্রে কর্ম নির্ধারণের রীতি ছিল তবুও ব্যতিক্রম স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেয়া হতো। নিম্ন শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। সকলেরই সকল গুণ আছে কেবল গুণের পরিমাপের তারতম্য। ব্রাহ্মণের মাঝেও যোদ্ধার গুণাবলী আছে। প্রাচীন যুগের ঋষিরা কৃষিকাজ করেছেন কখনও কখনও যুদ্ধও করেছেন।

জাতিগত সংঘাত দূর করার জন্য হিন্দু মতবাদ নিরাপদ গণতন্ত্রের পন্থা প্রবর্তন করেছে। তা হচ্ছে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে প্রস্ফূটিত করে তাকে উন্নত করা এবং একের উন্নয়নের জন্য অন্যের উন্নত উন্নতিকে ব্যাহত না করা। প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক গোষ্ঠীই অনুপম নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় এবং তার একটি মূল্য আছে। তার ব্যক্তিত্ব উচ্চতর নৈতিকতার কাছে শ্রদ্ধার দাবিদার। যদিও বৈদিক আর্যগণ ভারতে নিজেদের পছন্দনীয়ভাবে জীবন শুরু করেছিলেন, সম্পূর্ণ অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। শীঘ্রই তাঁরা মনের দিক দিয়ে উদার হয়ে উঠলেন। সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য একটি নৈতিক বিধান 'মানবধর্ম' তাঁরা গড়ে তোলেন ভারতের বিভিন্ন জাতিকে যারা একত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদেরকে আজ হিন্দু সমাজের নির্মাতা বলে পুজো করা হয়। রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে সভ্যতা বিস্তারের জন্য প্রাগৈতিহাসিক গোত্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। তিনি আর্য ও অনার্যগণকে একত্রিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং বুদ্ধই তাই করেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বলেন,

"A study of other religions is essential for the understanding of one's own and is a valuable constitutent of one's general culture."[১৪]

রাধাকৃষ্ণণের মতে আজ থেকে একশ বছর আগে ব্যক্তিভিত্তিক সমাজ ধারণাই ছিল সমাজতত্ত্বের শেষ কথা। আজ সামগ্রিক সমাজচিন্তা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জ্যান্ত সমাজ একটি দুর্বল ফেডারেশন নয়- যেখানে উচ্চতর মজুরি ও সুবিধা লাভের জন্য শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী, কৃষক, কামার, তাঁতি সকলে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে। বিভিন্ন পেশার লোকদের নিজ নিজ সম্ভাবনা অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক অনুভূতি, প্রয়োজন ভাল মন্দ সবকিছুতে ঐক্যবোধ। এই প্রসঙ্গে বর্ণ প্রথা সম্পর্কে অনেক বলার আছে। বর্ণ প্রথা সামাজিক সমাজচিন্তা থেকে উদ্ভূত এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের ভিত্তি। বর্ণ প্রথায় ব্যক্তি চিন্তা ও ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সমাজচিন্তা বেশি। সেবা ধর্মীয় কর্তব্য। সেবা ধর্মে অস্বীকৃতি প্রকাশ নির্দয়তারই নামান্তর।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভের দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় উচ্চবর্ণের লোক যতটুকু এগুতে পারে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোক এর চেয়ে কম পারে না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন, "আমার শরণাপন্ন যারা তারা নিম্নবর্ণের হোক, স্ত্রীলোক হোক বা শুদ্র হোক সাধনার সর্বোচ্চ স্তর লাভ করতে পারে।"[১৫] তুচ্ছ ব্যক্তিরাও ভক্তিভরে ঈশ্বরের নাম করতে করতে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারেন। স্ত্রীলোক শুদ্ধ এবং পতিত ব্রাহ্মণও তন্ত্র সাধনার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হতে পারেন। ঈশ্বর আবেশ ধনী, দরিদ্র, সবল, দুর্বল সকলের মাঝেই সমভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। ঈশ্বরপ্রেম কোন শ্রেণীর মানুষের হাতে কুক্ষিগত নয় কিংবা বাজারের সওদা নয়, বোধের পরিবর্তন হলেই সামাজিক বৈষম্য দূর হয়।

রাধাকৃষ্ণণের মতে, মুক্তি লাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নিজ নিজ চিরায়ত পথ অনুসরণ করেন। আমরা সকলেই মুক্তি লাভের যোগ্য। উচ্চ তিন বর্ণের মানুষ মুক্তির জন্য বৈদিক ত্যাগ তিতিক্ষা অনুসরণ করেন, যা শুদ্রদের দেয়া হয় না। উপনয়ন এবং বেদ অধ্যয়ন শুদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ। সেদিনকার সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সম্ভবত নিজেদের গুরুত্ব রক্ষার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

বৈদিক কর্মকাণ্ড এবং বেদ অধ্যয়ন ছাড়াও দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়। শঙ্করাচার্য অনুমোদন করেন যে সুত এবং বিদুর তাঁদের পূর্বজন্মের কর্মফলের দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মহাকাব্য ও পুরাণাদি অধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, ব্রত, উপাসনা এবং পূজা পার্বণের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করা যায়। প্রত্যেক মানুষকেই সাধারণ মানুষ থেকে সিদ্ধি লাভের স্তরে পৌঁছতে হয়।

ইতিহাসের উষালগ্ন থেকেই ভারতে সাম্যে চলে আসছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বশিষ্ট ও বিশ্বমিত্রের দ্বন্দ্ব থেকে। বশিষ্ট ছিলেন রক্ষণশীলতার প্রতিভূ আর বিশ্বমিত্র ছিলেন প্রগতির পুরোধা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির সৈনিক। রক্ষণশীল বশিষ্ট চেয়েছিলেন বেদ অধ্যয়ন কেবলমাত্র আর্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতো কিন্তু বিশ্বমিত্র বেদ অধ্যয়নের অধিকার সকলের মধ্যে ছড়িতে দিতে চেয়েছিলেন। উপনিষদের আন্দোলন ছিল গণতান্ত্রিক। যেমনটি রাধাকৃষ্ণণ অনুধাবন করেছিলেন।

আজ আমরা সৃজনশীলতার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। আমরা আমাদের পুরনো বিশ্বাসকে নতুন চোখে দেখতে শুরু করেছি। আমরা বুঝি আমাদের সমাজ একটি অস্থায়ী সাম্যাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। পর্বতে অনেক অনেক রগ্ন, মৃত গাছ আছে যেগুলো উপড়ে ফেলা দরকার। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে একমত যে, হিন্দু মতবাদের মৌলিক নীতির পরিবর্তন দরকার নেই। জটিল এবং গতিশীল সমাজ বিধানের প্রেক্ষিতে সেই নীতিগুলোর গুণ বর্ণনার প্রয়োজন। সময়ানুযায়ী পুনব্যক্তকরণ সেই পুরাতন প্রক্রিয়ারই পুনরুক্তি যা হিন্দু মতবাদের ইতিহাসে অনেকবার ঘটেছে। এই সমন্বয় প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। শিকড় যখন গভীরে থাকে তখন সম্প্রসারণ ঘটে খুব ধীরে। কিন্তু যারা অন্ধকারে একটি ছোট প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন তারাইতো সমগ্র আকাশকে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেন।

৪.৫ ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রসঙ্গ

মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে এশিয়া ও ইউরোপ দুটি পরিপূরক দিক। এশিয়া আধ্যাত্মিক দিক, আর ইউরোপ বৌদ্ধিক দিক। কখনও কখনও এ দুটি ধারা মিলিয়ে গেছে, তাই পরস্পরের উন্নতির কারণ হয়েছে। প্রথমত: মিশরীয়, ক্যালডিয় এবং ভারতীয় প্রাচ্য প্রজ্ঞা পিথাগোরাস এবং প্লেটোর মত পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাবান্বিত করেছে। খ্রীষ্ট জন্মের পূর্বে আলেকজান্ডারের পশ্চিম এশিয়া আক্রমণে এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন গমনে দ্বিতীয়বার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে

সংযোগ ঘটেছে। অশোকের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে বৌদ্ধ প্রচারকদের এন্টিয়কের সিলিউকাইড এর রাজদরবারে এবং আলেকজেন্দ্রিয়ার টলেমি বংশের দরবারে প্রেরণা করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মবলম্বীদের দ্বারা স্পেন ও ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীর আক্রমণ তৃতীয়বার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংযোগ বিধান করে। এই তিনবারের সংযোগ কতটা এবং কিভাবে মহান গ্রীসীয়-রোমান, খ্রীষ্টীয় এবং বর্তমান সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করেছে, তা নির্ণয় করা কঠিন। বর্তমান পৃথিবীতে যেভাবে বিভিন্ন লোকেরা পরস্পরের নিকটে এসেছে, তার মধ্যে মানবজাতির ভবিষ্যতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশার বাণী নিহিত রয়েছে। কর্মে বা চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এখন আর বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে যে সংযোগ অনিয়মিত এবং সংক্ষিপ্ত ছিল এখন তা নিয়মিত এবং স্থায়ী হয়েছে।

গ্রীকরা এবং রোমানরা বিশ্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জন্য ঈশ্বরের কথা ভাবতো, অসীমের সঙ্গে সসীমের সম্পর্ক সমস্যার সমাধান গ্রীকদর্শনে হয়নি এবং প্লেটো ও অ্যারিস্টটল এই সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন তা দ্ব্যর্থজ্ঞাপক এবং অসন্তোষজনক। অবতারবাদ এই সমস্যা থেকে নিষ্কামণের একটা পথ। এখন আর ঈশ্বর মানব জগৎ থেকে নিরর্থক দূরত্বের দ্বারা পৃথক নয়, ঈশ্বর মানবজাতির মধ্যে বাস্তবে প্রবেশ করেছে এবং ফলে মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের চরম ঐক্য সম্ভব হয়েছে। যীশুর মধ্যে দিব্য ও মানুষের সম্মিলন লক্ষ্য করা যায়। দেশাতীত আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন।

যীশু ধর্মকে জীবনের আলোকবর্তিকা এবং নিয়ামক করতে চেয়েছিলেন। আনুষ্ঠানিক কর্তব্যের স্থানে তিনি এক নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বাহ্য আচরণ আনুগত্যের চেয়ে একটি ভগ্ন ও অনুতপ্ত হৃদয় এর মূল্য বেশী শুধু বাহ্য আচরণ মেনে চলা বৃথা ও অনুর্বর যদি প্রাণপদ ঐশ্বরিক ভাব তার মধ্যে না থাকে। পিতা এবং মাতা, স্ত্রী ও পুত্রের দাবির চেয়ে ঈশ্বরের আহ্বান অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু আমরা ধর্মকে জীবনের নিয়ামক শক্তি করতে রাজী নই। আমরা গ্রীক 'পরিমিতি' এর সঙ্গে ধর্মকে গ্রহণ করি। যাঁরা ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্য ঐহিক জগৎ থেকে পালিয়ে যান সেই সাধুরা পৃথক শ্রেণীর প্রাণী। তাঁরা প্রার্থনায় ও সদনুষ্ঠান জীবন কাটান। নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা তাঁদের জীবনের মূল, পাশ্চাত্যে যাঁরা যীশুর ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত তাঁরা হরিণকে খেতে দেন, তারার সঙ্গে কথা বলেন। আর যদি তাঁরা

কর্মহীন হন তবে তাঁরা পীড়িতের নিরাময়বিধান করেন এবং ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন। তাঁরা জনসাধারণের উল্লাস বা সামাজিক সমর্থন লাভের জন্য লালায়িত নন।

ধর্মে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে সঞ্চায়িত হয়েছে, কিন্তু ধর্মতত্ত্ব অগ্রসর হয়েছে বিপরীত পথে। নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং সংজ্ঞার্থ প্রীতি সহ পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদী ধর্মের প্রাচ্যের স্বজ্ঞাবাদী ধর্মের মতই যেমন দোষ আছে, তেমনি মহৎ গুণত্ত আছে। একটি সাধারণভান্ডারে বিচক্ষণতা, বিজ্ঞান ও নিয়মানুবর্তিতা দিয়েছে আর অপরটি দিয়েছে স্বাধীনতা, মৌলকত্ব ও সাহস। যদি নিরূত্তাপ সমালোচনা এবং পিঠ-চাপড়ানো রায়া দেওয়ার স্থানে পারস্পরিক গুণগ্রহণ প্রতিষ্ঠা পায় তবে আজকের দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন দৃঢ় আধ্যাত্মিক ঐক্যের পথ প্রস্তুত করতে পারে। প্রাচ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি অতিরঞ্জিত শ্রদ্ধা যে সমস্ত ঐহিক অবস্থা না থাকলে পারত্রিক লক্ষ্যের সাধনা করা যায় না তাদের সম্বন্ধে উদাসীন করে রেখেছে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা, ক্ষয়িষ্ণু ও দূষিত মৃত আকারের পাষাণে পরিণত হয়েছে। তথ্য এবং সত্য নিয়ে আলোচনা না করে আমাদের রক্ষণশীল পন্ডিতেরা মধ্যযুগীয় পুঁথিগত বিদ্বানদের মন নিয়ে শাস্ত্রের ভাষা এবং শব্দের বিশ্লেষণ করে সমস্যার সমাধান করতে চান। আমাদের সংস্কারর্থীরা মৌলিকতাবিহীন ও জীবনপ্রদ অভিজ্ঞতার সংস্পর্শবর্জিত পাশ্চাত্যের পরোক্ষ অনুকরণে উৎসাহী। পাশ্চাত্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে প্রাতিস্বিক অন্যের সেবা করে নিজের মুক্তির সাধনা করে। দিব্যের নিবিড়তর সান্নিধ্য লাভের জন্য নির্জনবাসই যথেষ্ট নয়, ধর্ম শুধু জীবনাতীতই নয়, জীবন পরিবর্তনকারীও। পীড়িত মানবতার সেবার যথার্থ পূজা। প্রত্যেকটি মানবাত্মার অপরিসীম মূল্য স্বীকৃতিই সারধর্মের চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব। সমস্ত মানবাত্মার সচেতন ঐক্যবোধের দিব্যানন্দ মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ দূর করে। মানবজাতির ঐক্যানুভূতির সম্বন্ধে স্বজ্ঞা থাকায় সত্যধর্ম এক আধ্যত্মিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। জাতি বা মহাদেশের মধ্যে তাকে সীমাবদ্ধ করতে সাহস করে না। সমগ্র মানবজাতিকেই তার আওতায় আনতে চায়। এই মানবপ্রেমই অন্য মানুষের প্রত্যয়কে যে সমাদার করা দরকার তা আমাদের শেখায়। এই গুণে প্রাচ্যধর্ম পাশ্চাত্য ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। নিজের ধারণা ও মূল্যবোধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা সকল মানুষের মধ্যেই সাধারণত: দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সকলেরই এই জাতীয় মানসিকতার প্রতি এক প্রকার সংকীর্ণ সহানুভূতি আছে। সরল বিশ্বাস, বিশেষ করে মানুষের আধ্যাত্মিক আকুলতা সম্পর্কিত সরল বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মত জঘন্য কাজ আর নেই। আমরা অতীতের মত এখন আর শুধু শব্দের দাস নই। আমরা মার্কার আড়ালে যে

জীবন আছে তাকে দেখতে পাই। আমরা যতটা প্রত্যাশা করি তার চেয়েও শীঘ্র এমন দিন আসবে যখন গীর্জা, মন্দির এবং মসজিদ সমস্ত সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সমাদর করবে, যখন পাম্পরিক বন্ধুত্ব ও সেবার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মানুষের প্রতি ভালবাসাই শুধু প্রয়োজন হবে, যখন সমগ্র মানবজাতি এক নামে পরিচিতি না হলেও একই ভাবধারায় আবদ্ধ থাকে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বালুতটে ঝিনুক কুড়ানোর মত সহজেই ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। শ্রমসাধ্য সাধনায় আমাদের ধৈর্য্যও নেই, শক্তিও নেই। আমরা যেমন ব্ল্যাক ওয়েল কোম্পানী থেকে বই কিনি, চাষীদের কাছ থেকে ডিম কিনি বা ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনি, তেমনি আমরা আশা করি একজন পাদ্রী বা পুরোহিত কয়েক শিলিং মূল্যে সপ্তাহ এক ঘন্টা করে আমাদের ধর্ম দেবেন। কিন্তু ধার্মিক হতে হলে অনেক মূল্য দিতে হয়। মানুষের সাধনার প্রারম্ভ থেকেই বাসনা ও ধারণাকে বাস্তবে রূপায়ন সহজসাধ্য ছিলনা। ভারতের মহান রাজপুত্র বুদ্ধের রাজ্য, রাজপ্রাসাদ এবং সমস্ত রকমের সুখ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি এ সমস্ত থেকেই নিজেকে বঞ্চিত করেছিলেন। এ সমস্তই পরিত্যাগ করেছিলেন কঠিন হৃদয় বলে নয়, সত্যকে চাইতেন বলে এই ভাবেই তিনি তাঁর আবেগপ্রবণ প্রকৃতি জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং নিজের মধ্যে বিশ্বকে প্রতিফলিত করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম যে মানবের দুঃখ বরণকে এক অতিপ্রাকৃত মানুষের কম্পার ফল মনে করা হয় তা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রত্যেক মানুষের দায় হয়ে দাঁড়ায়। সেই সুখী যে নিজের কর্তব্য বুঝতে পারে এবং তা পালন করে, যদিও সেই কর্তব্য সাধনের জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম, দুঃখ ও রক্তের মূল্য দিতে হয়।

তথ্যসূচি

১. Dhiraj Kumar Nath, *Hinduism: Religion of Faith and Philosophy*, Sukhendu Bikas Majumder, S.S Printing and Packaging, Dhaka, 2005, p-3.

২. Ibid, p-6.

৩. S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, Blackie and Son, Bombay, 1983, p-17.

৪. S. Radhakrishnan, *Indian Religions*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1983, p-128.

৫. S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, Blackie and Son, Bombay, 1983, p-12.

৬. Ibid, p-18.

৭. Dr. Paitoon Patyaiying, *S. Radhakrishnan's Philosophy of Religion*, Kalpaz Publication, Delhi-110052, 2008, p-39.

৮ Ibid, p-153.

৯. S. Radhakrishnan, *Religion & Culture*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1982, p-23-24.

১০. S. Radhakrishnan, *True Knowledge*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1984, p-112.

১১. S. Radhakrishnan, *Religion & Culture*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1982, p-32.

১২. S. Radhakrishnan, *True Knowledge*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1984, P-128.

১৩. Ibid, p-130.

১৪. Radhakrishnan Reader, *An Anthology*, Bharatiya Bidya Bhavan, Bombay, 1969, p-129.

১৫. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪র্থ অধ্যায়, শ্লোক-১৩।

৫ম অধ্যায়

সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, সমকালীন জগতের ঐক্য নতুন সাংস্কৃতিক ভিত্তি দাবি করছে। আসল সমস্যাটা এই সাংস্কৃতিক ভিত্তি কি অধুনা অর্থনৈতিক এবং প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, না আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে? যে যান্ত্রিক জগতে মানুষ আত্মাহীন দক্ষ যন্ত্র পরিণত হয় তা মানব সাধনার উপর্যুক্ত আদর্শ হতে পারে না। আমরা এমন এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই যা তার সংকল্পে শুধু প্রবলভাবে উচ্ছ্বাসিত দক্ষ যন্ত্র পরিণত হয় তা মানব সাধনার উপর্যুক্ত আদর্শ হতে পারে না। আমরা এমন এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি চাই না যা তার সংকল্পে শুধু প্রবলভাবে উচ্ছ্বাসিত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনই স্বীকার করবে না। আত্মার গভীর প্রয়োজনগুলিও স্বীকার করবে। কোন সভ্যতার প্রকৃত পরিচয় তার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নেই, রয়েছে আত্মার মূল্যবোধ এবং মানসিক উপাদানে ধর্ম সভ্যতার আভ্যন্তরীণ দিক, সামাজিক সংগঠন রূপ দেহের যেন আত্মা। বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকৌশল, অর্থনৈতিক জোটবদ্ধতা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বকে বাহ্যত একত্র করতে পারে, কিন্তু স্থায়ী এবং শক্তিশালী ঐক্যের জন্য ভাব ও আদর্শের অদৃশ্য অথচ গভীরতর দৃঢ় বন্ধন দৃঢ় করা দরকার। মানবসংসার পুর্নর্গঠনের কাজে ধর্মের স্থান বিজ্ঞানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমাহার। এদের প্রত্যেকেরই যথোপযুক্ত পুষ্টির প্রয়োজন। খাদ্য ও ব্যায়ামের দ্বারা দেহ সবল ও কর্মক্ষম থাকে, বিজ্ঞান ও সমালোচনা মনের খোরাক যোগায় এবং শিল্প ও সাহিত্য, দর্শন ও ধর্মের উপর আলোকপাত করে। মানবজাতির ভাবমূর্তি ঘটাতে হলে সুন্দরতর শক্তিগুলির অনুশীলনের দ্বারাই তা করা সম্ভব। জীবনের মহানদী যে স্থানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার ঢাল অনুযায়ী নিজ গতিপথ তৈরি করে নেয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, সৃষ্টিধর্মী স্বজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করাই প্রাচ্য চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বিচারমূলক বৃদ্ধির অনুসরণই পাশ্চাত্য চিন্তার বেশি ভরসা যা কেবলমাত্র যৌক্তিক তা সজীব, মূর্ত এবং প্রাতিস্বিক থেকে স্বতন্ত্র। যুক্তিবিদ্যা সকলকে অভিন্নতায় পর্যবসতি করতে চায়। কিন্তু কোন জিনিসই তার অস্তিত্বের দুই অনুগামী ক্ষণে অভিন্ন থাকে না। বুদ্ধি প্রবাহমান স্রোতকে জমাট বরফে পরিণত করতে চায়। সত্যকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে হয়, শুধু যুক্তি দিয়ে বুঝলে চলে না। প্রাচ্য বিশ্বাস করে, এমন সব সত্তা আছে যা সুস্পষ্টভাবে গোচর হয় না। এমনকি ধরে নেয় যে লোকের প্রতিপাদ্য ভাষায় সুসম্বদ্ধ করার যৌক্তিক প্রচেষ্টা তাদের প্রতি অবিচার করে; কিন্তু পাশ্চাত্য

চায় সুস্পষ্টতা, গুহ্যতাকে এড়িয়ে যেতে চায়। যা প্রকাশ করা যায় এবং যা আমাদের অব্যবহিত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে তাই প্রকৃত যা প্রকাশ করা যায় না এবং অব্যবহার্য তা অপ্রকৃত যথার্থই বলা হয়েছে- দক্ষতা এবং সূক্ষ্মদর্শিতা প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও গ্রীকদের আসল ধর্মীয় স্বজ্ঞা কমই ছিল। এই দিক থেকে ব্যবহারিক দৃষ্টিসম্পন্ন পাশ্চাত্য ও রহস্যঘন অনুভূতিপ্রবণ প্রাচ্যের পথ সর্বদাই ভিন্ন। প্লেটোর অতীন্দ্রিয়বাদের প্রতি সহানুভূতি থেকে বোঝা যায় তিনি সাধারণ গ্রীকদের চেয়ে কত ভিন্ন।

পাশ্চাত্য ধর্মে আকার ও সংজ্ঞার্থের জন্য খুব উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। পরমের ধারণাকে আধ্যাত্মিক সত্তা বা অমূর্ত শক্তি বা বিশ্বব্যাপ্ত ছায়াময় শক্তিরূপে দেখা গ্রীক মনকে তৃপ্ত করে না। দেবতাদের নির্দিষ্ট দৈহিক দেখা গ্রীক মনকে তৃপ্ত করে না দেবতাদের নির্দিষ্ট দৈহিক বিশেষত্ব সমেত রূপাত্মা প্রকৃতি থাকা চাই। গ্রীক মনের নবত্বারোপ প্রবনতা সুবিদিত। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের ওপর খ্রীষ্টধর্মের গুরুত্বদান গ্রীক বৌদ্ধিকতার উত্তরাধিকার। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, “Hinduism represents an effort at comprehensiveness and co-operation. It recognizes the diversity in man’s approach towards and realization of the one supreme reality.”[১]

প্রাচ্যে ধর্ম বলতে আত্মিক জীবন বোঝায়। পৃথিবীতে সত্য প্রেম ও সৌন্দর্যের ভাবের সঙ্গে মানুষের ঐক্যের উপলব্ধিই ধর্ম। এ মত বৌদ্ধিক সংকল্পের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করে না। তাদের সত্য সরলীকরণের ভীরু প্রচেষ্টা বলে মনে করে। এই ধর্ম দিব্যকে অফুরন্ত বলে মনে করে এবং তাঁর সম্ভাব্য অভিব্যক্তি ও অগণিত বলে বিশ্বাস করে। প্রকাশের অতীত এমন জিনিস আছে যেখানে প্রকাশ পৌঁছায় না, অথচ সেই অন্তর্নিহিত বিষয়ই সমস্ত প্রকাশকে সজীব করে এবং তাদের মধ্যে তাৎপর্য ও নিহিতার্থ বিধান করে। তিনি ঈশ্বরকে বন্ধু বা ত্রাণকর্তা, মানুষের প্রতিমূর্তিতে গড়া অথবা পাথরে খোদাই করা প্রতীক রূপে সম্বোধন করেননি। তিনি অদৃশ্য তাঁর যাজকও নেই, তাঁর পুজা মন্দিরে হয় না। তাঁর আবাস কোথায় কেউ জানে না। রাধাকৃষ্ণণের মতে, “Hindusim is not bound up with a creed or a book, a prophet or a founder. It is a persistent search for truth on the basis of a continuously renewed experience. It is human thought about God in continuous evolution.”[২]

প্রাচ্যে ধর্ম বলতে অন্তর জীবনের উৎকর্ষ সাধন বোঝায়। ধর্ম আধ্যাত্মিক মুক্তি সূচনা করে এবং মুখ্যত: পর্বতশিখরে বা মন্দিরে নির্জনে একাকী কঠোর সাধনায় লব্ধ ব্যক্তিগত অধিকার বা নিজস্ব সম্পদ বোঝায়। রাধাকৃষ্ণণের মতে, প্রাচ্যধর্মের প্রবণতা পরলোকের দিকে আর পাশ্চাত্য ধর্মের বৈশিষ্ট্য ঐতিকতা। প্রাচ্যধর্মের লক্ষ সাধু এবং বীরপুরুষ সৃষ্টি। আর পাশ্চাত্য ধর্মের উদ্দেশ্য সুবুদ্ধি ও সুখী লোক উৎপাদন। প্রাচ্যধর্ম সমাজরক্ষার চেয়ে জীবাত্মার মুক্তির উদ্দেশ্য চালিত। পাশ্চাত্য সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্মকে এক প্রকার পুলিসী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করে। মানবতাবাদী আদর্শ, সামাজিক সংহতি এবং জাতীয় দক্ষতার ওপর গুরুত্বদান পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য। ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ প্রথমে ধর্ম কি সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ধর্ম 'ধৃ' ধাতু থেকে উদূত, যার সোজা অর্থ হলো ধারণ করা। সাধারণ মানুষ ধর্মকে ধারণ করে, বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইহজগত ও পরজগতে শান্তি ভোগ করার আশা পোষণ করে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম। হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্মও বলা হয়। ঈশ্বর আর্য মনি ঋষিদের মাধ্যমে এ ধরাধামে যে আচার আচরণ বা বিধি নিষেধ দ্বারা এ পৃথিবীর মানুষকে নিয়ন্ত্রণ বা সুন্দরভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন তাই মূলত সনাতন ধর্ম। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ সর্বজীবের মুক্তি কামনা করেছেন। সর্বজীব মুক্তির বাণী ভারতের চিরায়ত বাণী– সর্বোপরিষদের বাণী। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন এই শাশ্বত জীবনের ভাষ্যকর। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন হিন্দুর জীবনবেদ-ব্যাখ্যাকার। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, "Hindusim is more a way of life than a form of thought while it gives absolute liberty in the field of thought it enjoins a strict code of practice. Hinduism insists not on religious conformity button a spiritual and ethical outlook in life."[৩]

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *"Eastern Religion and Western Thought"* বইটিতে সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই বইটিকে ধর্মের সন্ধিকাল হিসাবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। এখানে তিনি কিভাবে উপনিষদের অতীন্দ্রিয়বাদ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে চলেছে তা ব্যাখ্যা করেছেন। ড. রাধাকৃষ্ণণ ১৯৪১, নভেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমার্বতন ভাষণে বলেন যে,

"সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথাও মানতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারেননি। চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা ভয় আমাদের প্রিয় দেশের বিস্তর ব্যবধান করে চলেছে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তার দ্বারা হয় না। আমাদের পারম্পরিক ও সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় বোঝা যায়।"[৪]

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে। তিনি এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে উপনিষদ, ভগবদগীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে ধরনের কাজ করেছেন তা পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, "যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে।"[৫] তাঁর লেখা বহু বইয়ের মধ্যে *"The Hindu View of Life"* বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বহুদেশী ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

তাঁর লেখা বিভিন্ন বই থেকে তাঁর ধর্মচিন্তার নানা বিষয়কে জানা যায়। তাঁর একটি অন্যতম পুস্তক *"Kalki or the Future of Civilization"* এই বইটিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করছে। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের শাশ্বত সত্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ওপর জোর দিতে হবে। এই দুটোর সমন্বয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। রাধাকৃষ্ণণের বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মূল্যবান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বিশেষ অবদান। সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, "বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, যুদ্ধরোধ করা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন সাধন করা এ সবেরই ভিত্তি সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ রাষ্ট্র সংঘে প্রদত্ত তাঁর মানব প্রেমের বাণী, বিশ্বশান্তির বাণী এবং One World বা একটি বিশ্বরাষ্ট্রের আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।"[৬]

সমগ্র বিশ্বে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি ধর্মের নামে মৌলবাদের অপতৎপরতা, নিপীড়ন, নির্যাতন ধর্মীয় মানবতার বাণী চারিদিকে আজ ভূলুণ্ঠিত। সেখানে বিশিষ্ট দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের অমিয় বাণীর প্রসার আজ বেশি প্রয়োজন, যার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতামূলক মনোভাব। সেজন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন তথা ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূচি

১. S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life*, Blackie and Son, Bombay, 1983, p-83.

২. Ibid, p-86.

৩. Dr. Paitoon Patyaiying, *S. Radhakrishnan's Philosophy of Religion*, Kalpaz Publications, Delhi-110052, 2008, p-94.

৪. সন্ধ্যা বাগচী, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা*, প্রাচী পাবলিকেশন্‌স্, হাওড়া, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-১৫।

৫. S. Radhakrishnan, *An Idealist View of Life*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1929, p-98.

৬. সন্ধ্যা বাগচী, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা*, প্রাচী পাবলিকেশন্‌স্, হাওড়া, কলকাতা, ২০০৭, পৃ-৩০।

উপসংহার

উপসংহার

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে ভারতবাসী রাষ্ট্রপতি হিসাবে যতটা মনে রেখেছে তার থেকেও অনেক বেশি দিন ভারতবাসী তাঁকে মনে রাখবে তাঁর দর্শন ও ধর্মের ওপর লেখা প্রামাণ্য পুস্তকের জন্য। তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে তিনি সমগ্র জীবনের অর্থকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা যেতে পারে যে ভারতীয় দর্শনে রাধাকৃষ্ণণ এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন চিন্তাধারাকে এই যুগের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাচীনবিদ্যা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মূল্যের মধ্যে নতুন করে এক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তাঁর মতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে। তিনি এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে উপনিষদ, ভগ্‌বদগীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে ধরনের কাজ করেছেন তা পাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

তিনি ১৯১৮ সালে *The Philosophy of Rabindranath Tagore* বইটি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শন এই প্রথম ইংরেজিতে লেখা হয় এবং তিনি অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বইটি পড়ে নিজে রাধাকৃষ্ণণকে শান্তি নিকেতন থেকে একটি চিঠি লেখেন।

এ ছাড়াও ভারত সরকার প্রকাশ করেছে রাধাকৃষ্ণণের *Occasional Speeches and Writings.* এই বইগুলি থেকে জানা যায় রাধাকৃষ্ণণ কবে, কোথায় কি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখা থেকেই জানা যায় তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের পান্ডিত্য। তাঁর যে বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পান্ডিত্য আছে তা খুব সূক্ষ্ম পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয় কিন্তু একটি সূচিপত্র প্রকাশ করে বলা যেতে পারে তাঁর জ্ঞানের পরিধি কতখানি এবং তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনায়াসে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর কাছে "দর্শন কোন বুদ্ধির ব্যায়াম ছিল না, ছিল এক অখন্ড জীবনবোধের সহায়ক জ্ঞান।"[১] প্রাচীন ভারতীয় আস্তিক্যবাদী প্রজ্ঞার সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর নানা দর্শন চিন্তার সমন্বয়ে তাঁর মনোজগৎ গঠিত হয়েছে। তাই প্রাচ্যচিন্তার প্রতিভূ হয়েও তিনি একাধারে বৈশ্বিক ভাবনার বাসিন্দা; আন্তর্জাতিক হয়েও ভারতীয় দর্শনেরই ব্যাখ্যাতা। ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে,

"আত্মার সদ্‌গতি লাভ যেমন ধর্মের শেষ লক্ষ্য
তেমনি সত্যের আবিষ্কারও দর্শনের মূল উদ্দেশ্য।"[২]

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *Religion & Society* বইটিতে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে যে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান সেটাকে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এই বইটিতে তাঁর ধর্মদর্শন সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় এবং এই বিষয়ে আরেকটি বই উল্লেখযোগ্য সেটি হল ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত *Education, War and Politics.* এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণণ প্রসঙ্গে মুখ্য আলোচ্য বিষয় তাঁর ধর্মদর্শন। ধর্ম সম্পর্ক তিনি বিভিন্ন স্থানে যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিভিন্ন লেখনী থেকেই তাঁর ধর্মদর্শন সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে।

ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মতে, "ধর্ম কোন শিক্ষায়তন হতে আহরিত নির্যাস নয়, বা কোন অনুষ্ঠান উদযাপন নয়, জীবন বা অভিজ্ঞতার মাঝে বাস্তবতার প্রকৃতিকে অবলোকন করা অথবা সত্যকে অনুভব করাই হচ্ছে ধর্ম।"[৩] ধর্ম বিশ্বাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাস কোন অভিমত নয় বা সমষ্টিও নয়, এ অভিমত যতই সঠিক হোক না কেন। বিশ্বাস হল আত্মাকে দেখা, যে শক্তির দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহকে উপলব্ধি করা যায়। যদি বিশ্বাসকে সঠিকভাবে, সতরূপে অনুভব করা যায় বা আত্মিক প্রত্যয় স্থাপন করা যায় তবে এই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা বিশ্বাসকেই ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। তাঁর মতে হিন্দুদের মূলধর্মগ্রন্থ বেদ। আত্মা সম্পর্কে স্বজ্ঞাত হবার শক্তি কথাই প্রকাশ করে। বিশ্বাসের বলে আত্মার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এমন অভিজ্ঞ জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতাই বেদে বর্ণিত আছে। এই কারণেই পুরুষানুক্রমিক ভাবে হস্তান্তরিত বৈদিক কাহিনী, বিশ্বাস বা প্রথা পবিত্রতা দ্বারা আবৃত্ত হয়ে সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করেছে এবং এভাবেই একটি সভ্যতা মুক্ত, অবিরাম ও বাঁধাহীন বিকাশে সাহায্য করেছে। তাই হিন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম, চিরন্তন এবং অনন্তকাল ধরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করছে এবং তার প্রচার ও প্রসার ঘটবে যুগ-যুগান্তর এবং অনাদিকাল ধরে।

আজ 'মানুষ' গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন জীবনকাঠামোতে একটি আমূল পরিবর্তন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। রাধাকৃষ্ণণের মতে, "এই পরিবর্তন বস্তুর ক্ষেত্রে নয়, বরং প্রয়োজন মানব স্বরূপের ভিত্তির ক্ষেত্রে।"[৪] সামগ্রিকভাবে জীবনের প্রতি একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সচেতন সত্তার উপর নির্ভরশীল একটি

নিরপেক্ষ ও নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। আর এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার ক্ষমতা ও সংকটের কারণে যে পীড়ন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। মানুষ আত্ম স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে জন্মায় না। সে কারণে ভোগ-সুখের অসংখ্য উপকরণ থাকার পরও সে তার সৃজনশীলতার বিকাশের মাধ্যমে উচ্চতর লক্ষ্যে উপনীত হতে চায়। এই লক্ষ্যে উপনীত হয়ে উন্নত জীবনযাপনের জন্য মানুষকে তার সুবুদ্ধি ও কল্যাণবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। মানুষের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তার অন্তর সত্তা তথা প্রকৃত ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে। ব্যক্তির নিজের স্বরূপ তার কাছে স্পষ্ট হলে নতুন সমাজ গঠনে তার ভূমিকাও তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এই স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমেই সে তার কর্মকে জীবনের ক্ষেত্রে সুসামঞ্জস্য করে গড়ে তুলতে পারে শান্তিপূর্ণ এক মানবিক বিশ্ব।

তথ্যসূচি

১. শ্রী করুণা কান্ত নাথ, *হিন্দুধর্ম ও মূল্যবোধ*, সুখেন্দ বিকাশ মজুমদার, সুফলা প্রিন্টার্স, আর.কে. মিশন রোড, ঢাকা, ২০১৫, পৃ-৩।

২. পূর্বোক্ত, পৃ-৫।

৩. S. Radhakrishnan, *Religion & Society*, George Allen and Unwin Ltd., London, 1966, p-97.

৪. Ibid, p-103.

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

১. S. Radhakrishnan, *Religion & Society,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1948.

২. S. Radhakrishnan, *Eastern Religions & Western Thought*, A Galaxy Book, Oxford University Press, New York, , 1959.

৩. S. Radhakrishnan, *Religion & Culture,* Orient Paper Backs, New Delhi, 1982.

৪. Radhakrishnan, *Indian Philosophy (vol I and II),* George Allen and Unwin Ltd., London, 1923.

৫. S. Radhakrishnan, *The Creative Life,* Orient Paper Backs, New Delhi, 1975.

৬. S. Radhakrishnan, *Occasional Speeches and Writings (May 1962-May 1964),* Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

৭. S. Radhakrishnan Vice President of India, *Occasional Speeches and Writings (Oct 1952- Feb 1959)*, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

৮. S. Radhakrishnan, *Occasional Speeches and Writings (July 1959-May 1962),* Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

৯. S. Radhakrishnan, *Education, Politics and War,* The International Book Service, Poona, 1944.

১০. S. Radhakrishnan, *True Knowledge,* Orient Paper Backs, New Delhi, 1984.

১১. S. Radhakrishnan, *Freedom and Culture,* G.A Natesam & Co., Madras, 1936.

১২. S. Radhakrishnan, *The Dharamapada*, Oxford University Press, London, 1950.

১৩. S. Radhakrishnan, *Contemporary Indian Philosophy,* George Allen & Unwin Ltd., London, 1958.

১৪. S. Radhakrishnan, *The Bhagavad Gita,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1948.

১৫. S. Radhakrishnan, *President Radhakrishnan's Speeches and Writings (May 1964-May 1967),* Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India.

১৬. S. Radhakrishnan, *Recovery of Faith,* Vision Books, New Delhi, 1983.

১৭. S. Radhakrishnan, *The Philosophy of Rabindranath Tagore,* Macmillan, London, 1918.

১৮. S. Radhakrishnan, *An Idealist View of Life,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1929.

১৯. S. Radhakrishnan, *The Hindu View of Life,* Blackie and Son, Bombay, 1983.

২০. S. Radhakrishnan, *Indian Religions*, Orient Paper Backs, New Delhi, 1983.

দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Sources)

১. Naravane, V.S, *Modern Indian Thought*, Asia Publishing House, Bombay, 1967.

২. S.K. Dhawan, *Sarvapalli Radhakrishnan (1888-1975),* Wave Publications, Delhi, 1991.

৩. C. Nagraja Rao, *S. Radhakrishnan his Life and Works*, Mital Publication, Delhi, 1986.

৪. Sarvapalli Gopal, *Radhakrishnan A Biography*, Oxford University Press, Delhi, 1989.

৫. Dr. Paitoon patyaiying, *S. Radhakrishnan's Philosophy of Religion*, Kalpaz Publications, Delhi-110052, *2008*.

৬. Dhiraj Kumar Nath, *Hinduism: Religion of Faith and Philosophy*, Sukhendu Bikas Majumder, S.S. Printing and Packaging, Dhaka, 2005.

৭. Rabindranath Tagore, *The King of the Dark Chamber,* Macmillan, London, 1955.

৮. Rabindranath Tagore, *Creative Unity,* Macmillan and Co., London, 1959.

৯. Rabindranath Tagore, *Personality,* Macmillan, London, 1959.

১০. Rabindranath Tagore, *The Religion of Man,* George Allen and Unwin Ltd., London, 1949.

১১. Harendra Prasad Singha, *Religious Philosophy of Tagore and Radhakrishnan,* Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1960.

১২. শ্রী করুণা কান্ত নাথ, *হিন্দুধর্ম ও মূল্যবোধ*, সুখেন্দু বিকাশ মজুমদার, সুফলা প্রিন্টার্স, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা, ২০১৫।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *মানুষের ধর্ম*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৩।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ধর্ম*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা, ১৩১৫।

১৪. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতিদ্বীপে*, র‍্যাড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০১৩, ১৯৭৮।

১৫. ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ*, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯, ২০১৪।

১৬. সন্ধ্যা বাগচী, *সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের শিক্ষাচিন্তা*, প্রাচী পাবলিকেশনস্, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

১৯৪১, নভেম্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ

বিষয়- Hindu Muslim Relations.

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথা মানতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারেননি। চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা, ভয় আমাদের প্রিয় দেশের বিস্তর ক্ষতি সাধন করে চলেছে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তার দ্বারা হয় না, আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় বোঝা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের উদার এবং ভবিষ্য-দৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করে, জীবনের চিরকালীন সত্যগুলির দ্বারা ছাত্রদের মন আলোকিত হবে এমন আশা আমরা করি। অবিভাজ্য সত্যের দ্বারা প্রভাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষা কি সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতজনের বোধিতে সমগ্র বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হবে এমন আশা কি সার্থক হয়েছে? এই উদার বিশ্ব বীক্ষায় বাধার সৃষ্টি করে জাত্যাভিমানের আড়ম্বর। জাতীয়তা বা দেশপ্রেমের বিকৃত ধারণাই এই উগ্র অভিমানের কারণ। বস্তুতপক্ষে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে সুস্থ এবং উদার জাতীয়তার কোন বিরোধ নেই। আদর্শ হিসাবে আর্ন্তজাতিয়তাবাদ মোটেই বিরস, বর্ণহীন কোন একঘেঁয়েমি একটি কথার কথা মাত্র নয়। যথার্থ জাতীয়তাবাদ একটি সোপান যা আমাদের উত্তরণ করিয়ে দেয় আন্তর্জাতিকতার উদার, প্রসারিত বোধে। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার যথার্থ জাতীয়তার প্রতিনিধিত্ব করেন সম্রাট অশোক এবং পরবর্তীকালে বাদশাহ আকবর। এঁরা সর্বপ্রকার গোঁড়ামিকে ঘৃণা করতেন। সহনশীলতা ও মিলনভাবের ওপর জোর দিতেন।

সাধারণত মনে করা হয় ইসলাম জাতিগত ও ধর্মগত সুসম্পর্কের অধিকারী। এমন ধারণা সঠিক নয়। পবিত্র কোরআনে সহনশীলতার কথা আছে। আল্লাহ পয়গম্বরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে তিনি প্রতি পৃথক জনসমষ্টির জন্য পৃথক আরাধনা পদ্ধতি বিধান দিয়েছেন অতএব বিশ্বের মানবরা যেন এই পদ্ধতির বিষয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ না করে। হিন্দু ও বৌদ্ধরা যেমন বিভিন্নভাবে ও পদ্ধতিতে সাধনা ও অনুষ্ঠান করতে পারে, সেইরকম বাবর পুত্র হুমায়ুনকে তার উইলে নির্দেশ দিচ্ছেন-বৎস হুমায়ুন ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বাস করছেন, এতএব কোন ধর্মীয় সংকীর্ণ সংস্কার দ্বারা চালিত হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

কোন ধর্মের ধর্মস্থান বিনষ্ট করবে না। সুবিচারের সহিত রাজ্যশাসন কার্য চালিয়ে যাবে। বাবরের উদারভাবের যথার্থ উত্তরসূরী হলেন আকবর। ঔরঙ্গজেব বিপরীত মতে ও কর্মে নিজ সাম্রাজ্য নষ্ট করলেন। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানেরা এই মূলজাতি হতে জাত। হিন্দু মুসলমানেরা একসাথে কাজ করেছে। পরস্পরের পূজা আরাধনাকে শ্রদ্ধা করেছে। এর ফলে এমন ধরনের সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে যা সমস্ত সংকীর্ণতাকে দূরে করে দিয়েছে। এই সংস্কৃতিই ভারতীয় সংস্কৃতি। শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্গণে, এমন কী ধর্মাচরনেও এদের পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে হিন্দু-মুসলমানরা একই সঙ্গে পরস্পরের উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। যুদ্ধেও উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একই শিবির থেকে লড়াই করেছে, সিপাহী বিদ্রোহ এর দৃষ্টান্ত। ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই এদেশের জাতীয়তা বোধের চেতনা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্বাধীনতা ও একতার জন্য এক জাতীয় আকাঙ্খা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও এটা সত্য যে ব্রিটিশ রাজ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কিছু রাজপুরুষ ভারতবাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ভয় পেয়ে এই দেশের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে উদ্যোগী হন।

এক সময় হিন্দু ও মুসলমানরা উদার মনোভাবাপন্ন ছিল এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল। ভারতের বাইরেও তারা ভারতীয় দেশপ্রেমিক বলে পরিচিত ছিল। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদই রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান ও আরব দেশগুলি স্ব স্ব জাতীয়তাবাদ নিয়ে সম্পূর্ণ ছিল। সেই সময় ভারতে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অফিস, ব্রিটিশ পলিসি নির্ধারণ করতো। ওখান থেকেই প্রসূত হয়েছিল ইসলাম ধর্মরাজ্যের ধারণা। ভারতীয় রাজনীতিতে এর কুফল হল সুদূরপ্রসারী ও সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ক্রমবিস্তারী। এই অশুভ সাম্প্রদায়িক বাতাবরনে আমরা ভারতীয়রা সুনাগরিক হলাম না। হলাম দলগতভাবে সাম্প্রদায়িক।

ভারতকে বহুবার বহু সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে আবার ভারত তা অতিক্রমও করেছে কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা। এই সমস্যার সমাধান করতে গেলে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে হবে এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই ভাবতে হবে যে আমরা ভারতীয় অর্থাৎ যথার্থভাবে ভারতীয় জাতিতে উত্তরণের সমাধানের পথ। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে এবং একটি সুস্থ, শোভন ও মানবিক জীবনের মান নির্মাণ করতে হবে। আমাদের সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধা ও অর্থনৈতিক সমাধানের দায়িত্ব সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন সকল সম্প্রদায়ের মানুষের স্থান হয়। সাম্প্রদায়িক মনোভাব কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে, এ সংস্কার কারও স্বভাবজাত নয়। আমাদের মধ্যে সঠিক ও সদর্থক চেতনা জাগাতে হলে সংকীর্ণ জাতিগত সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করতে হবে। পরস্পরকে বুঝতে পারার মধ্য দিয়েই সব বাধা দূরীভূত হবে। এই মহৎ কাজ আমাদের বিদ্যায়তনগুলিই সম্পাদন করতে পারে। আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিতর্কসভায়, ক্রীড়াক্ষেত্রে সব রকম ভুল বোঝাবুঝি এবং সন্দেহ অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব রচিত হয়। যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হয়, তাহলে আমাদের নাগরিকত্বের আদর্শটিকে উদার করতে হবে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণ জাতপাতের কৃত্রিম ভেদ রেখাগুলিকে মুছে দিতে হবে। যথার্থ শিক্ষার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ চিন্তা ও সঠিক মনোভাব গঠনে উৎসাহ দান করতে পারে। কিছু অসাধু ধুরন্ধর ব্যক্তি আদর্শ বিরোধী কাজে লিপ্ত আছে এই কথা মনে করে আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য হবে সত্যের প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখা এবং বিনষ্ট ও আর্ত মানুষদের সেবায় আত্মনিবেদন করা।